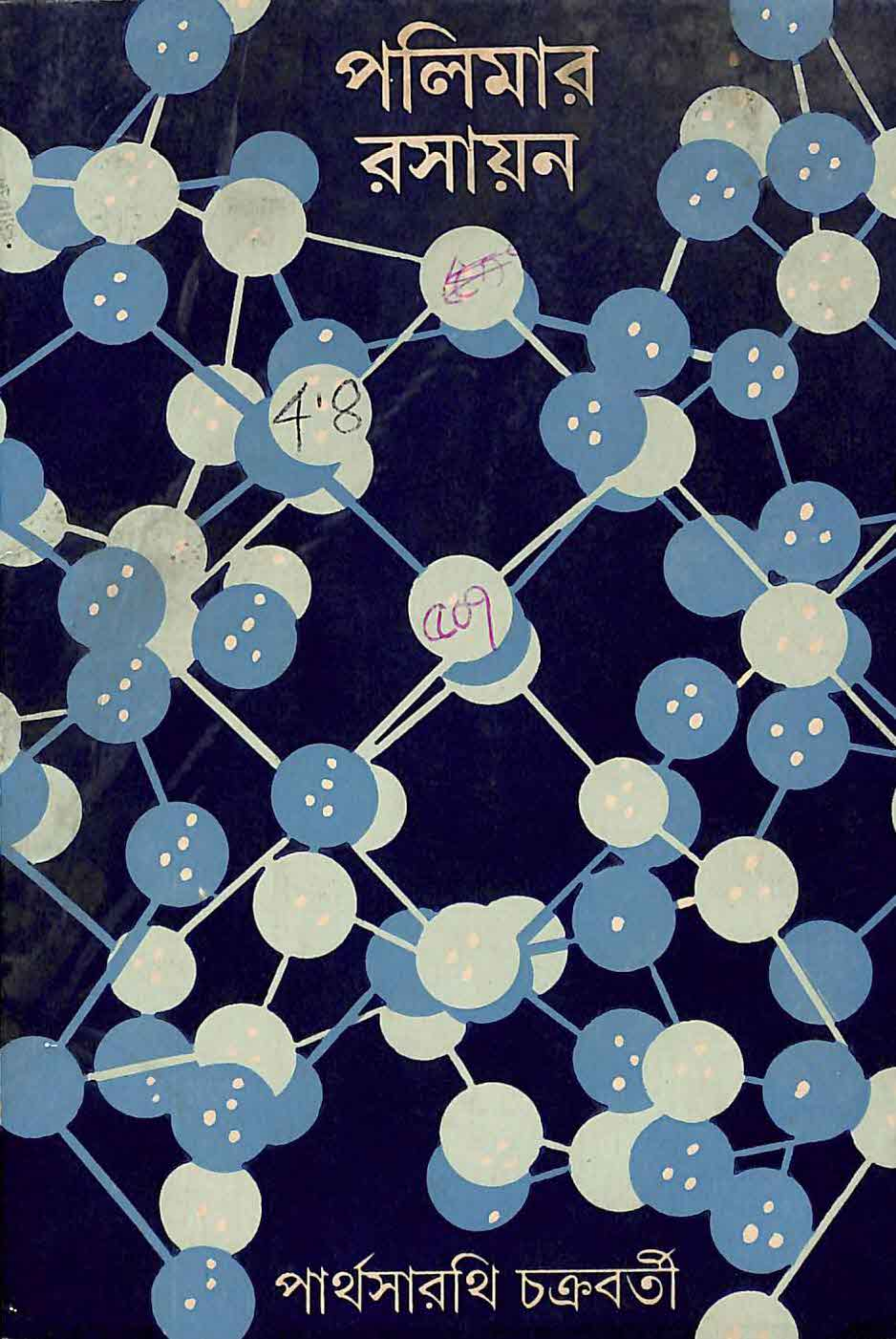
পলিমার রসায়ন



পার্থসারথি চক্রবর্তী

পলিমার রসায়ন

পার্থসারথি চক্রবর্তী

৪'৮

৫০৭

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা ৯

Acc. no. — 14974

প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ১৯৮৫
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ সঞ্জয় দে

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ফণিভূষণ দেব কর্তৃক
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে প্রকাশিত এবং
আনন্দ প্রেস অ্যাণ্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক পি ২৪৮ সি আই টি স্কিম নং ৬ এম
কলকাতা ৭০০০৫৪ থেকে মুদ্রিত।

মূল্য ৬·০০

মঞ্জু ও জীতেশ পাকড়াশীকে

এই লেখকের অন্যান্য বই

কেমিক্যাল ম্যাজিক
চিকিৎসাবিজ্ঞানের আজব কথা
রসায়নের ভেল্‌কি
ম্যাজিকের মত মজা
তত সহজ ছিল না
মজার এক্সপেরিমেন্ট
বুদ্ধি নিয়ে দারুণ মজা
পদার্থ বিজ্ঞানের খোশ খবর
ছোটদের বিজ্ঞানকোষ
বিজ্ঞানের বিচিত্রবার্তা

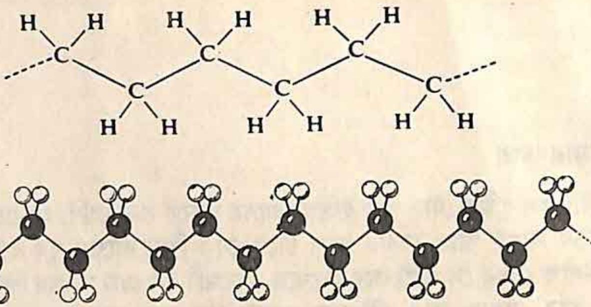
গোড়ার কথা

মানুষের বুদ্ধির দৌড় তার ইন্দ্রিয় বোধের চাইতে ঢের বেশি, জগতের সকল দৌড়ের সঙ্গেই পাল্লা দেবার স্পর্ধা রাখে সে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের খুব বড় মাপের জিনিসকে যেমন সে ছোট করে দেখেছে—তেমনি খুব ছোট মাপের জিনিসকেও বড় করে দেখতে তার কৌতূহল নেহাত কম নয়। 'অণু-পরমাণু লোকের অন্তঃপুরের খবর পর্যন্ত জানা গেল তাদের বন্ধুত্বের মেলামেশায়, সৌরভে, আলোকরশ্মি বিকিরণের ঝরনাধারায়, অতিসূক্ষ্ম বিদ্যুৎ-কণার সম্ভ্রান্ত মেজাজে, আর অপরূপ বর্ণচ্ছটার যৌগিক পদার্থ সৃষ্টি সুখের আনন্দ-উল্লাসে।

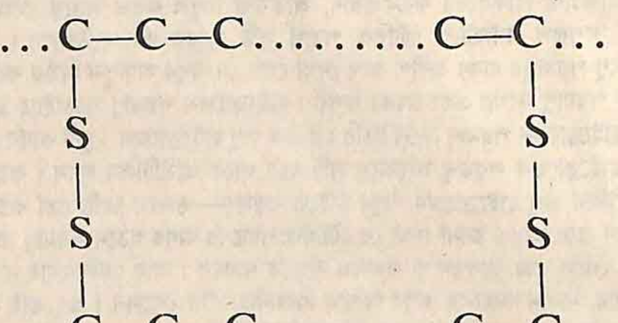
অণু-পরমাণুর রাজ্য জরীপ করে দেখা গেল যে অণুর আয়তন নির্ভর করে ঐ অণুর পরমাণু সংখ্যা এবং ভরের উপর। হাইড্রোজেন পরমাণু সবচাইতে হাল্কা, দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু মিলে তৈরি হয় এক অণু হাইড্রোজেন। দুটি কার্বন এবং দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু সংযোগে সৃষ্টি হয়ে থাকে এসিটিলিন গ্যাস। কাজেই এসিটিলিন অণু হাইড্রোজেন অণুর চাইতে বড়সড়—ওজনে ভারী তো বটেই। পরীক্ষা করে আরও জানা গেল যে যৌগিক পদার্থের অণুর গঠনে পরমাণু সংখ্যা বেড়ে গেলে তার আয়তন ও ওজনও বাড়তে থাকবে। আর সেইজন্যেই নানান চেহারার, নানান ওজনের অণুর অস্তিত্ব বিজ্ঞানীরা টের পেলেন। শুধু তাই নয়, এও জানা গেল প্রকৃতিতে যেমন খুব ছোট মাপের অণু রয়েছে তেমনি রয়েছে বড় মাপের অণু। কাজেই প্রকৃতির মধ্যে এই ধরনের খুব বড় জাতের অণুর সন্ধান পেয়ে বিজ্ঞানীরা ভাবলেন কি করে ল্যাবরেটরীতে কৌশলে কৃত্রিম উপায়ে এইসব বৃহৎ অণু সৃষ্টি করা যায়। তাঁদের এ প্রচেষ্টা সফলও হলো একদিন।

অতিকায় অণু

দুনিয়ায় এমন অনেক অণু আছে যারা আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের সেই দৈত্যের মতো—অতি ক্ষুদ্র কলেবর থেকে বিকটাকার রূপ পরিগ্রহ করতে পারে। লঙ্কাধিপতি রাক্ষসরাজ রাবণের সভায় রঘুপতি রামের দূত অঙ্গদ যেমন মহাবিক্রমে তার কলেবর স্ফীত করে যেরকম দানবের রূপ নিয়েছিল—অনেকটা

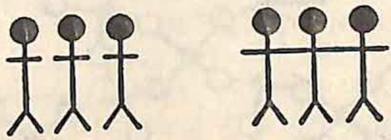


কার্বন ও হাইড্রোজেন পরমাণুর দীর্ঘশৃংখল।

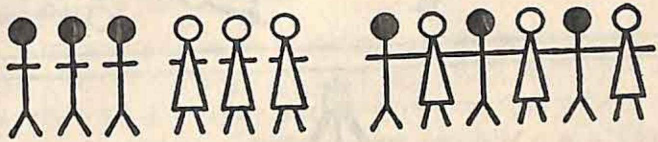


কার্বন ও সালফার পরমাণুর দীর্ঘ শৃংখল।

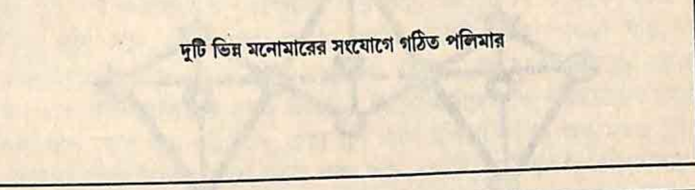
সেইরকম আর কি। রামায়ণের যুগ থেকে কলিযুগে ফিরে আসা যাক। এখানে চলচ্চিত্রের পর্দায় দ্য ইনক্রেডিবল ম্যান অথবা সুপারম্যান যেমন কোন অদৃশ্য মহামন্ত্রশক্তি বলে বিশাল অবয়বের অধিকারী হয়ে, ত্বরিতে সহসা স্রোতে ভাসমান তরুণীকে অতি সন্তর্পণে বাহুপাশে জড়িয়ে নিরাপদে তীরে পৌঁছে দিয়ে অলৌকিক কাজ করবার গৌরব অর্জন করে—ঠিক সেইরকম এইসব অতি সাধারণ অণু তার নিজের আদিম কলেবর বহুগুণ বাড়িয়ে অতিকায় দানবজাতের অণু সৃষ্টি করে থাকে। এই দানব অণুর কার্যক্ষমতাও সুপারম্যানের মতো অবিশ্বাস্য ও অলৌকিক। সে কথায় পরে আসছি।



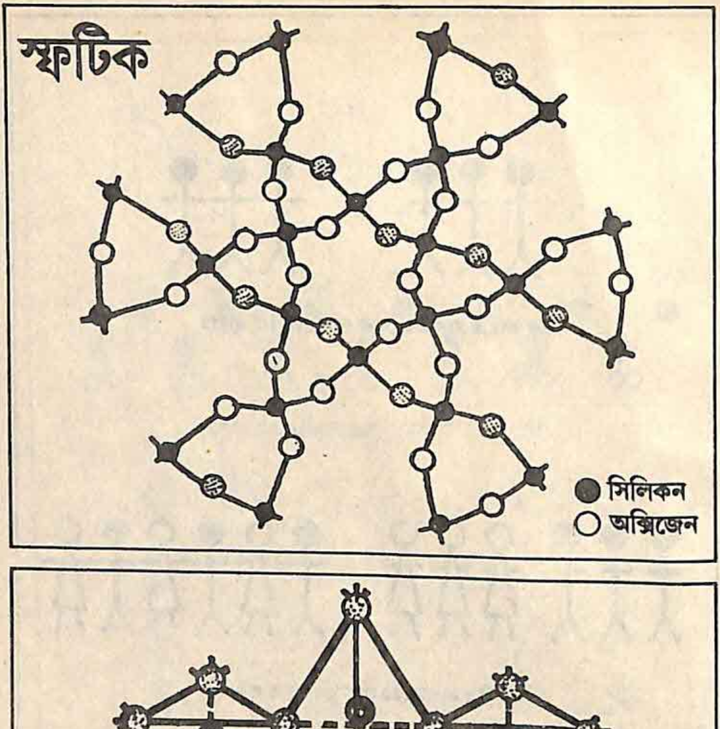
এক জাতীয় মনোমার থেকে পলিমার তৈরী হয়েছে



দুটি ভিন্ন মনোমারের সংযোগে গঠিত পলিমার



ফেনোল-ফরম্যালডিহাইড হচ্ছে এক ধরনের সিনথেটিক রেজিন এবং দীর্ঘ শৃংখলাবদ্ধ পলিমার। A ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে সেই রকম হাজার হাজার এক একটি ইউনিট অথবা লিংক পরস্পর শেকলের মতো জুড়ে পলিমার তৈরী করে।



স্ফটিকে সিলিকন ও অক্সিজেন পরমাণুর বিন্যাস।

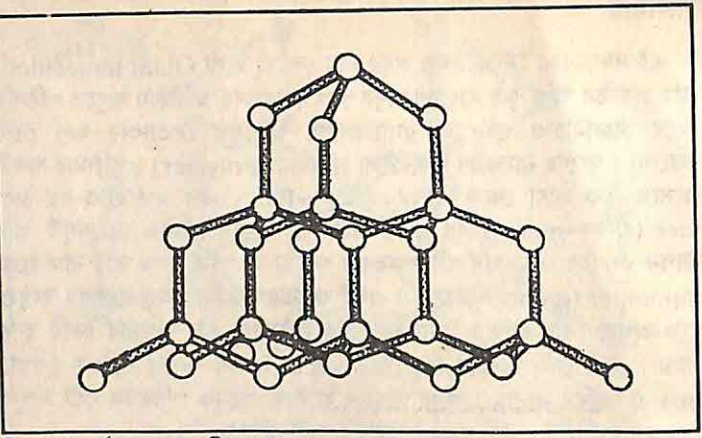
পলিমার

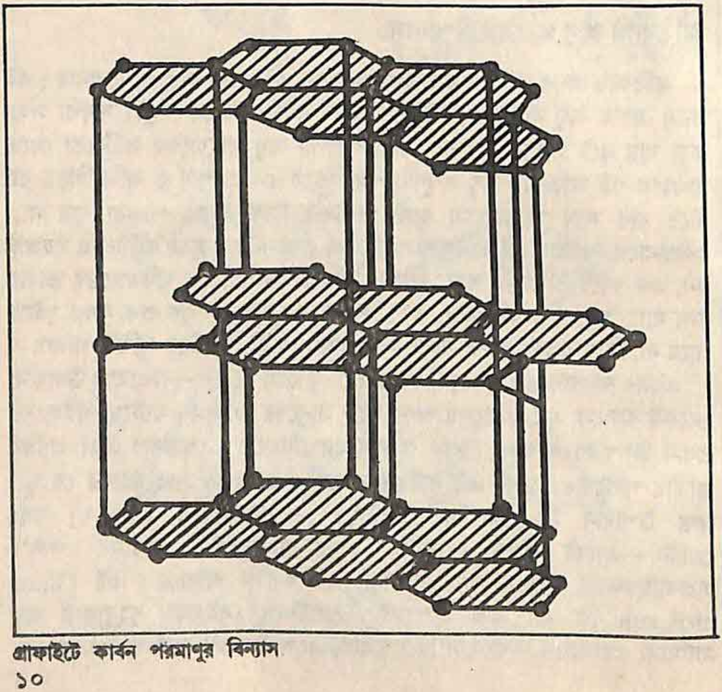
এই দানবাকার ইনক্রেডিবল অণুর নাম দেওয়া হলো Giant molecules ; আর প্রকৃতির অতি ক্ষুদ্র সাধারণ অণুর বৃহৎ দানবাকার অতিকায় অণুতে পরিণতি দেখে বিজ্ঞানীরাও কৌশলে রসায়নাগারে এইরকম দৈত্যাকার অণু তৈরি করলেন। তাদের নামকরণ করা হলো পলিমার (Polymer) ; পলিমার শব্দটি এসেছে গ্রীক ভাষা থেকে। Poly (গ্রীক—Polus)-এর অর্থ হচ্ছে বহু এবং mer (গ্রীক—meros)-এর মানে অংশ বা অনুরূপ। আর যে অণুটি তার আপন কলেবরকে বহুগুণ স্ফীত করবার ক্ষমতা বা স্পর্ধা রাখে তার নাম হলো monomer (mono—একক)। একই জাতের মনোমার অণু পরস্পর সংযুক্ত হয়ে অথবা ভিন্ন জাতের মনোমার অণুর সংযোগে এই পলিমার তৈরি হতে পারে। দেখা গেল সাধারণ অণু থেকে এই দৈত্যাকার অণুতে পরিণত হওয়ার ফলে ঐ আদিম মনোমার অণুর সাধারণ ধর্মেরও অনেক পরিবর্তন ঘটে সম্পূর্ণ আলাদা ধর্মবিশিষ্ট এক নতুন পদার্থের সৃষ্টি হয়েছে।

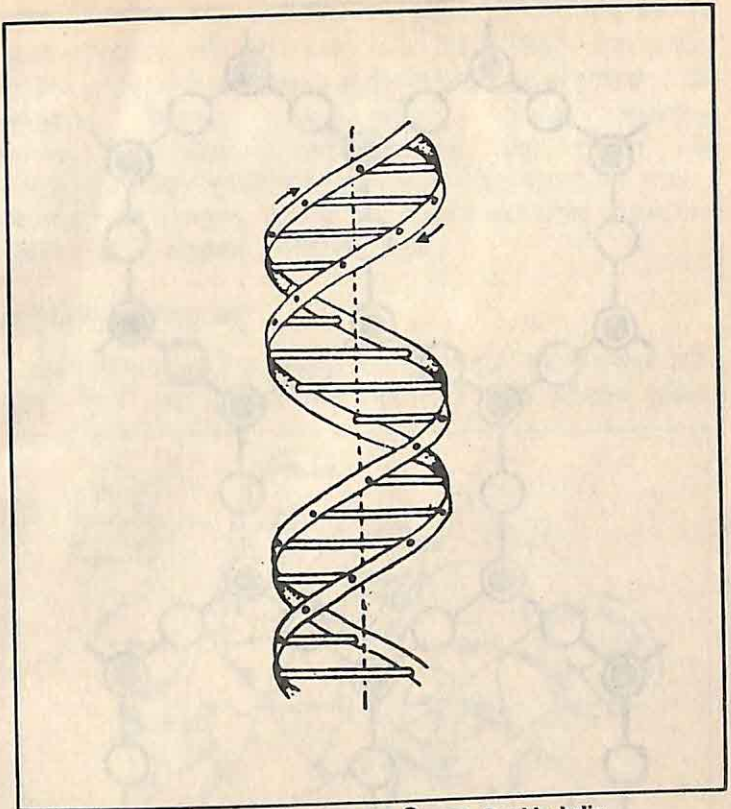
অতিকায় অণু গঠনের উপাদান

অতিকায় অণুর গঠনের মূল উপাদান হচ্ছে এই সরল অণু বা মনোমার ; এই সরল একক অণু বহুবার পুনরাবৃত্তির ফলে তাদের গঠনে কিছুটা সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় বটে। তবে কলেবর এবং পরস্পর অণু সংযোগের জটিলতা বেড়ে যাওয়ায় ওই অতিকায় অণু প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে এক আশ্চর্য ও অতি বিচিত্র ধর্ম নিয়ে যার সঙ্গে মনোমারের ধর্মের কোনও মিলই খুঁজে পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এই মনোমার অণুর দল যেন—'এক সূত্রে গাঁথিয়াছি সহস্রটি মন, এক কার্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন।' কিংবা মনোমারকে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় বলা যায়, 'ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃষ্টি বিন্দু, একা এক জনে যূথিকা কলির শুষ্ক মুখও ধুইতে পারে না, কিন্তু তাহারা সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটিতে পৃথিবী ভাসায়।'

এইসব দানবাকার অণু প্রকৃতিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে—সভ্যতার উষাকাল থেকেই অলক্ষে এই অতিকায় অণুর সঙ্গে মানুষের আলিঙ্গন ঘটেছে পরিধানের প্রধান উপকরণ কার্পাস, রেশম ও পশমের দৌলতে। শ্বেতসার এবং আমিষ জাতীয় পদার্থেও রয়েছে এই দানবাকার অণু। এমন কি দেহকোষের যে মূল সূক্ষ্ম উপাদান ডি এন এ (DNA), আর এন এ (RNA) এবং প্রোটিন—এসবই হচ্ছে অতিকায় অণুর উদাহরণ। জীবনের স্পন্দন ধারাবাহিকভাবে ছড়িয়ে পড়ে বংশানুক্রমের আদিম আঁধারে। এই Giant molecule ডি এন এ-র মাধ্যমেই। প্রোটিনও সেইরকম বৃহদাকার অণু অ্যামিনো অ্যাসিডের দীর্ঘশৃঙ্খল দিয়ে তৈরি, একে অপরের সঙ্গে যুক্ত ঠিক যেন


হীরকের কার্বন পরমাণুর বিন্যাস

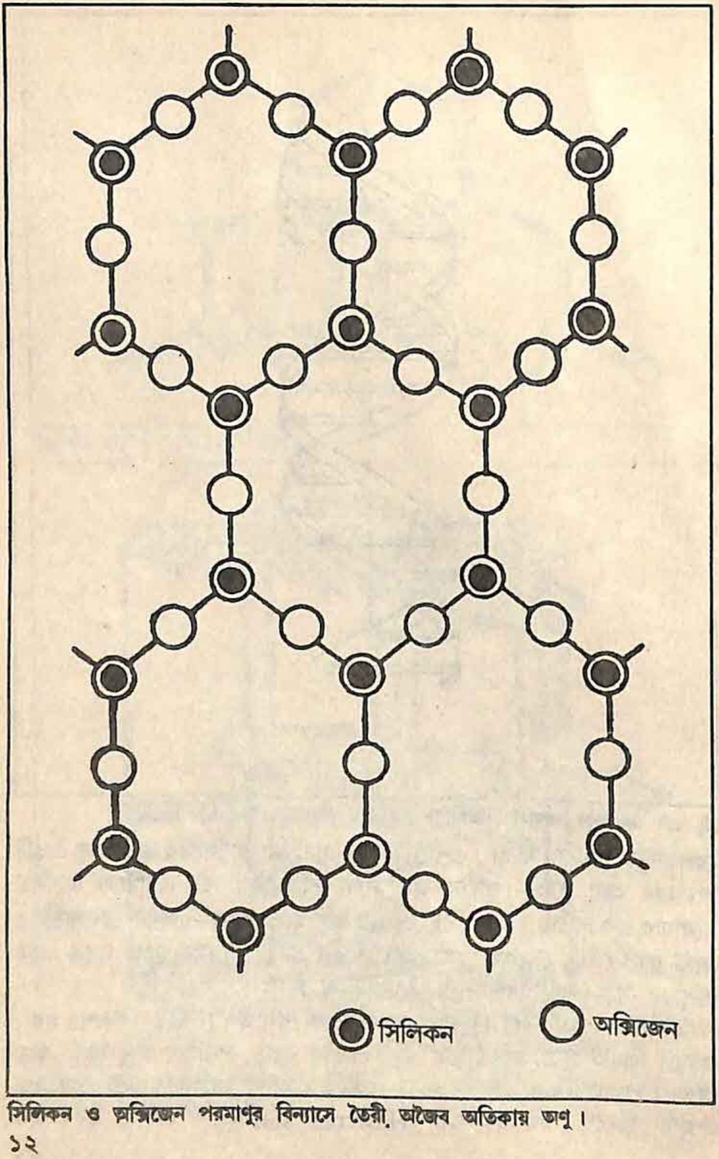

গ্রাফাইটে কার্বন পরমাণুর বিন্যাস



ডি. এন্ এ অণুর গঠন। বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন Dauble helix.

রেলগাড়ির কামরার মতো। এখানে একটি এ্যামিনো এ্যাসিডের অণু হচ্ছে একটি মনোমার আর সমগ্র প্রোটিন অণু হলো পলিমার। এই এ্যামিনো এ্যাসিড মনোমার একজাতীয় অথবা ভিন্ন জাতের অণু হতে পারে—যেমন রেলগাড়িতে ফার্স্ট ক্লাস কোচ, সেকেণ্ড ক্লাস কোচ অথবা এয়ার কণ্ডিসন কোচ থাকে একে অপরের সঙ্গে শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে—তেমন আর কি।

এসিটিলিন অণুর (C_2H_2) মনোমার থেকে বেনজিন (C_6H_6) উৎপন্ন হয়। এখানে তিনটি মাত্র এসিটিলিন অণু পরস্পর জুড়ে বেনজিন অণু তৈরি হয়ে থাকে। যে প্রক্রিয়ায় এই শৃঙ্খলাবদ্ধ বেনজিন অণুর আবির্ভাব ঘটে তার নাম দেওয়া হয়েছে পলিমারিজেসন (Polymerisation) ; অবশ্য যখন বহু

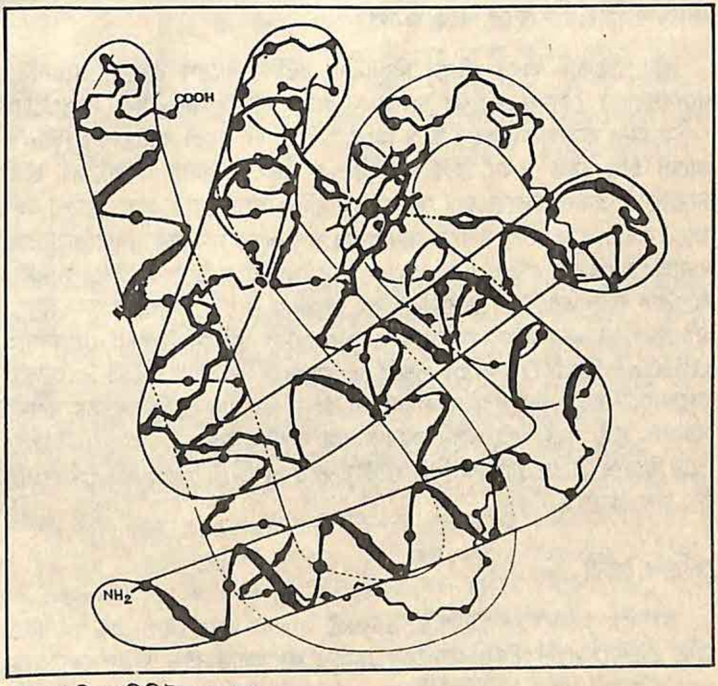


সিলিকন ও অক্সিজেন পরমাণুর বিন্যাসে তৈরী অজৈব অতিকায় অণু।

এসিটিলিন অণু পরস্পর সংযুক্ত হবে $(C_2H_2)n$ অর্থাৎ যেখানে n-এর মান কয়েক হাজারেরও বেশি তখন তার নাম—পলিঅ্যাসিটিলিন। ঠিক তেমনি, ইথিলিন (C_2H_4) পলিমারিজেসনের ফলে পলিথিন $(C_2H_4)n$ তৈরি হয়। এই পলিথিনও নিঃসন্দেহে এক ধরনের পলিমার, শৃঙ্খলাবদ্ধ পরস্পর—CH_2—ইউনিট সংযুক্ত রাসায়নিক বস্তু, যেখানে এই —CH_2—ইউনিটের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে লক্ষাধিকবার। আগেই বলা হয়েছে, এই কারণে ওই দানবাকার পলিথিন অণুর আয়তন এবং ভরের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটবে, মনোমার ইথিলিনের চাইতে।

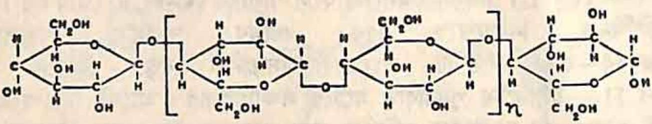
প্রাকৃতিক অতিকায় অণু

স্ফটিক (Quartz), হীরে, গ্রাফাইট, অভ্র ইত্যাদি হলো অতিকায় অণুর তৈরি অজৈব পদার্থ। তবে এই দানবাকার অণুর বিশিষ্ট ধর্ম ও আচরণের পরিচয়



মাইওগ্লোবিন মলিকিউল বা অণু

সেলুলোজ প্রাকৃতিক পলিমার



পাওয়া গিয়েছে জৈব পদার্থ (স্বাভাবিক ও কৃত্রিম) থেকে। যেমন সেলুলোজ (Cellulose), শ্বেতসার (Starch), প্রোটিন (Protein), রাবার ইত্যাদি।

প্লাস্টিক শিল্প কি করে গড়ে উঠল

এই অতিকায় অণুর অঙ্গনে বিজ্ঞানীরা বহুদিন প্রবেশ করতে পারেননি। গবেষণাগারে কোনও পরীক্ষা চালানোর সময় যদি কোনও বস্তু তাপপ্রয়োগ অথবা অন্য রাসায়নিক বস্তুর সঙ্গে মিলে চিটেগুড়ের মতো আঠালো চটচটে বা কালো হয়ে যেত তখন সেই পরীক্ষাজাত বস্তুর একমাত্র আশ্রয়স্থল হতো ডাস্টবিন। একথা বলতে দ্বিধা কোথায় যে যদিও আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে রাবার, সেলুলোজ ইত্যাদি দানবাকার অণু থেকে মানুষের ব্যবহারোপযোগী নানাপ্রকার সামগ্রী প্রস্তুত করা হয়েছে—তবু বৈজ্ঞানিক উপায়ে এইসব সামগ্রীর আণবিক গঠন এবং তার রাসায়নিক ধর্ম বিশ্লেষণ প্রচেষ্টার যথেষ্ট অভাব ছিল। এই শতকের একেবারে প্রথমদিকে বেলজিয়ানের রসায়ন বিজ্ঞানী বেকেল্যাণ্ড (BECKELAND) কৃত্রিম পদ্ধতিতে ফেনোল ও ফরম্যালডিহাইড থেকে বেকেলাইট নামে এক ধরনের দানবাকার অণুর পলিমার তৈরি করলেন তখনই সকলের দৃষ্টি পড়ল এই নতুন নয়নাভিরাম বস্তুটির উপর—এর থেকেই পরে গড়ে উঠেছে বিবিধ প্লাস্টিক শিল্প। কিন্তু তাও একদিনে হয়নি—এর পিছনেও ইতিহাস আছে।

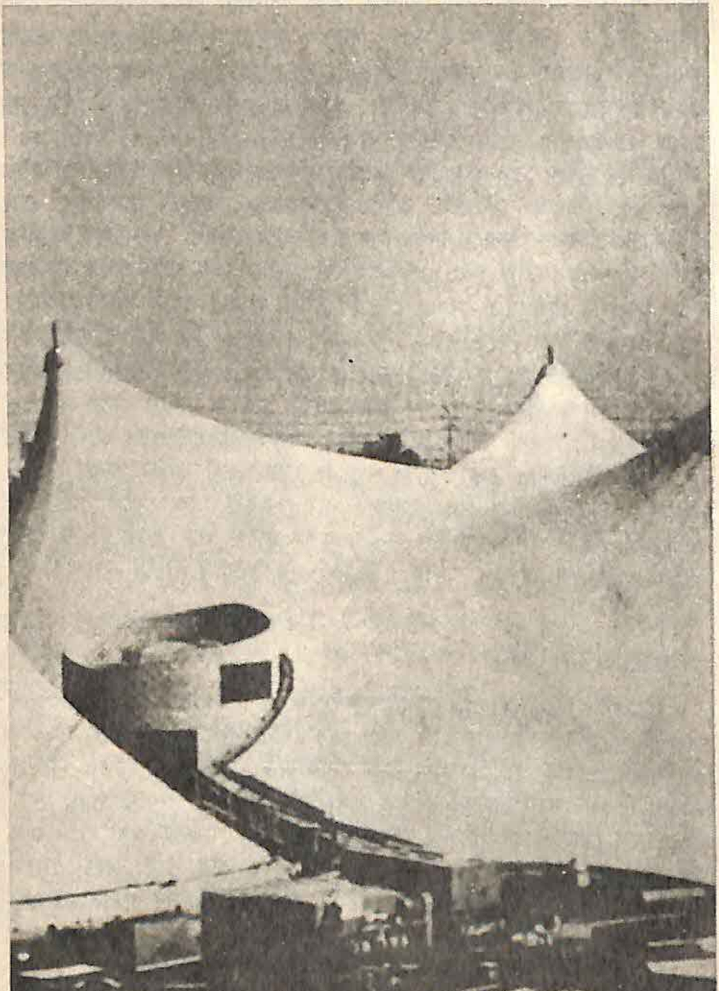
রেজিন তৈরী

ফেনোল আমাদের অতি পরিচিত একটি সাধারণ জৈব-যৌগ, এর গন্ধ আছে এবং এ্যান্টিসেপটিক ধর্মও অনেকের জানা। ফরমালডিহাইড উদ্ভিদ কোষে খুব অল্প পরিমাণে থাকে, ফটোসিন্থেসিসের সময় এটা তৈরি হয়। এই গ্যাসের তীব্র

ঝাঁঝালো গন্ধ থেকে তার অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়। ফেনোল এবং ফর্মালডিহাইড দুটো জিনিসই অতি সাধারণ মনোমার। ১৮৭২ সালে জর্মান রসায়নবিদ এডলফ ভন বাইয়ার (Adolf Von Baeyer) লক্ষ্য করলেন যে যখন বিভিন্ন ফেনোল জাতীয় বস্তু এবং এ্যালডিহাইডের বিক্রিয়া ঘটে তখন তার থেকে এক ধরনের রেজিন জাতীয় বস্তু (Resinous material) উৎপন্ন হয়। এই রেজিন অবশ্য ১৯০৯ সালের আগে বৃহৎ শিল্পে ব্যবহার করা যায়নি। ডক্টর লিও বেকেল্যাণ্ডই সর্বপ্রথম আবিষ্কার করলেন কিভাবে ফেনোল এবং ফরম্যালডিহাইডের ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে ব্যবহারোপযোগী ফেনোলিক প্লাস্টিক তৈরি করা যায়। তাপ এবং চাপ দিয়ে, ছাঁচে ঢেলে এই প্লাস্টিক উৎপন্ন করা হয়। সল্যুসন হিসাবেও কাগজ প্রভৃতি জোড়া দেবার কাজে এটাকে আঠার মতো ব্যবহার করা যেতে পারে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুটি বছরে দু'জন জর্মান রসায়নবিদ Wilhelm Krische এবং Adolph Spitteler এমন একটা জিনিস খুঁজছিলেন যা নাকি ব্ল্যাকবোর্ডের স্লেটকে সরিয়ে কাজে লাগানো যেতে পারে। তাঁরা আবিষ্কার করলেন ফরম্যালডিহাইডের সঙ্গে ছানার (Caesin) বিক্রিয়ায় এক ধরনের শক্ত শিংয়ের মতো কঠিন পদার্থ উৎপন্ন করে। যার বহুবিধ ব্যবহার রয়েছে। প্রায় ১৯০০ সাল থেকে বাণিজ্যিক পদ্ধতিতে এই কেসিন প্লাস্টিক জর্মানী এবং ফ্রান্সে শুরু হলো। এর ট্রেড নাম—গ্যালালিথ বা মৃদু পাথর (Gala—দুধ আর Lithos—পাথর)।

সেলুলয়েড

হাতির দাঁত দিয়ে বিলিয়ার্ড খেলার বল তৈরি হয়। একসময় আমেরিকায় এর আমদানি কমে যাওয়ায় বিলিয়ার্ড বলের ব্যবসায়ীরা পড়লেন মুশকিলে। তখন নিউইয়র্কের একটা ফার্ম ঘোষণা করল বিলিয়ার্ড খেলায় ঐ হাতির দাঁতের অনুরূপ বিকল্প কোন রাসায়নিক বস্তু যদি কেউ আবিষ্কার করতে পারে তবে তাঁকে বেশ মোটা টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। এই ঘোষণার কথা শুনে জন উইসলে হায়াট (John Wesley Hyatt) এবং তাঁর ভাই কাজে নেমে গেলেন। ওঁরা লক্ষ্য করেছিলেন কলোডিয়ন নামে এক ধরনের রাসায়নিক বস্তু দেহের কাটা জায়গায় ঢাললে সেখানে রক্ত তাড়াতাড়ি জমাট বেঁধে যায়। কলোডিয়ন তৈরি করতে ব্যবহার করা হয় নাইট্রোসেলুলোজ। হায়াট নাইট্রোসেলুলোজের সঙ্গে কর্পূর মিশিয়ে অবিকল হাতির দাঁতের মতো সাদা জিনিস তৈরি করে ফেললেন। এটাকে সহজেই ছাঁচে ঢালাই করা যায়। এটাই হলো সেলুলয়েড। প্রথম থেকেই সেলুলয়েডের সাদা, স্বচ্ছ বা রঙীন বস্তু তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। এর সবচাইতে বড় অসুবিধা হলো যে এটা দাহ্য।



ফাইবার গ্লাস রেইন ফোর্সড প্লাস্টিক অস্থায়ী ছাদ ইত্যাদি নির্মাণে কাজে লাগে। এখানে রেসিন হিসাবে ব্যবহৃত হয় টেফলন ফ্লুরোকার্বন।

সেলুলোজ প্রাকৃতিক পলিমার

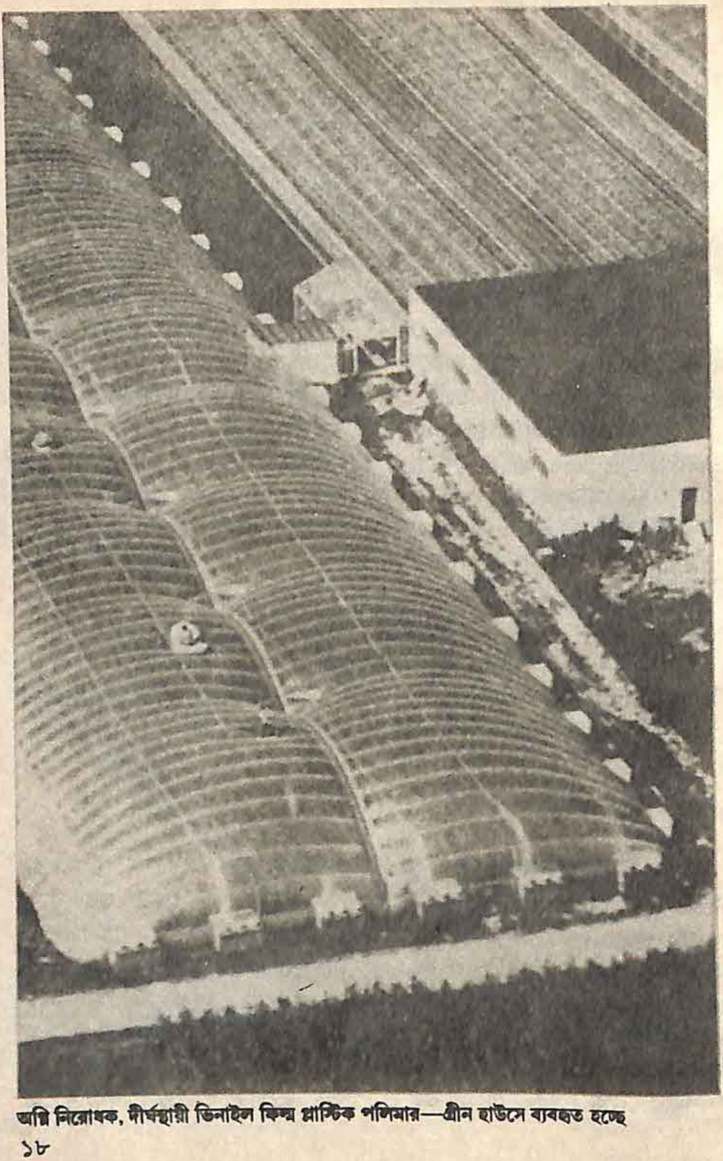
অগ্নি-নিরোধক সেলুলোজের জিনিস তৈরি করতে গিয়ে সেলুলোজ এ্যাসিটেট আবিষ্কার হয়ে গেল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় এটা আবিষ্কৃত হয়।

সকল উদ্ভিদ দেহের কাঠামোতে রয়েছে সেলুলোজ। এই সেলুলোজকে আশ্রয় করেই উদ্ভিদ সজীবতা পায়। কার্বন, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন পরমাণু থেকে তৈরি সেলুলোজ নিজেই একটা পলিমার। অনেকগুলো গ্লুকোজ ইউনিট মালার মতো পরস্পর জুড়ে তৈরি করে সেলুলোজ। অবশ্য একটা-দুটো গ্লুকোজ নয়—কয়েক হাজার গ্লুকোজ পরস্পর জুড়ে রয়েছে এখানে। কিন্তু হলে কি হবে গ্লুকোজ সহজে জলে গুলে যায়, সেলুলোজ জলে অদ্রবণীয়। তাছাড়া—এই সেলুলোজের প্লাস্টিক ধর্ম নেই মোটেই। সুতোর জামা-কাপড় এইজন্যে আমরা পরিধেয় হিসেবে ব্যবহার করতে পারি। এই সেলুলোজ থেকে সেলুলোজ এ্যাসিটেট তৈরি করা হয় এ্যাসিড দিয়ে। সেলুলোজের সঙ্গে নাইট্রিক এ্যাসিড মিশিয়ে যেমন নাইট্রো সেলুলোজ উৎপন্ন হয়—তেমনি নাইট্রিক এ্যাসিডের বদলে এ্যাসেটিক এ্যাসিড মিশিয়ে তৈরি হয় সেলুলোজ এ্যাসিটেট। এই রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে সেলুলোজের প্লাস্টিক ধর্ম দেখা যায়। এই সেলুলোজ এ্যাসিটেট প্লাস্টিক থেকে নানা ধরনের জিনিস যেমন—চিরুনী, ব্রাস, যন্ত্রপাতির হাতল, টর্চ, পেন, ফটোগ্রাফিক ফিল্ম, টেবিল ক্লথ, খেলনা এইসব তৈরি হচ্ছে। সেলোফেন কাগজও তৈরি করা যায় সেলুলোজ থেকে—প্যাকিং করবার কাজে এটা আমাদের খুবই কাজে আসে।

শ্বেতসার বা স্টার্চ (starch) হচ্ছে সেলুলোজের জাত ভাই। উদ্ভিদ দেহের কাঠামো তৈরি হয় সেলুলোজ দিয়ে, তবে উদ্ভিদের সঞ্চিত শক্তি ভাণ্ডার হলো স্টার্চ। শ্বেতসারও অতিকায় অণুর সমাবেশে গঠিত হয়েছে।

আধুনিক দুনিয়ায় পলিমার

আজকের আধুনিক দুনিয়ায় যে দিকে চোখ পড়বে সেখানেই পলিমারের ছড়াছড়ি। সকালে ঘুম থেকে উঠে দাঁত মাজবার বুরুশ থেকে শুরু করে, সংবাদপত্র, ব্রেকফাস্টের রুটিমাখন, স্নানের বালতি, সাওয়ার, পোশাক-আশাক, অফিসের চেয়ার টেবিল এমন কি রাতে ঘুমোতে যাবার নরম বিছানাও তৈরি হচ্ছে U-ফোম জাতীয় তুলোর মতো নরম পলিমার বস্তু থেকে। সিন্থেটিক কাঠ, কাপড়, ওষুধের ক্যাপসিউল সিনেমার ফিল্ম, লাইফ বোট, স্ট্র-পাইপ থেকে শুরু করে জলের পাইপ, মাথার টুপি, পায়ের মোজা বাজারের থলে—কি না হচ্ছে পলিমার থেকে ? পলিমার প্লাস্টিক তো একটা যুগান্তর এনেছে। দেখতে ঠিক



অগ্নি নিরোধক, দীর্ঘস্থায়ী ভিনাইল ফিল্ম প্লাস্টিক পলিমার—গ্রীন হাউসে ব্যবহৃত হচ্ছে

কাঠের মতোই—ঠিক তেমনি রং, তেমনি আঁশ অথচ সেটা কাঠ নয়, প্লাস্টিক। ট্রেনের চেয়ার এই সিনথেটিক কাঠ দিয়েই তৈরি হচ্ছে। কয়েক বছর আগে জগতের সর্বপ্রথম আগাগোড়া প্লাস্টিকের তৈরি মোটরগাড়ি তৈরি হয়েছে। নৌকা, উড়োজাহাজের নানা অংশও প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি করা যায়। বাড়ির আসবাবপত্র তো আজকাল আকছার প্লাস্টিকের পাওয়া যাচ্ছে।

প্লাস্টিক আসলে কি জিনিষ

প্লাস্টিক কথাটির অর্থ হলো যা ছাঁচ অনুযায়ী গড়া যায়। পাথরকে প্লাস্টিক বলা চলে না। কেননা পাথরকে ছাঁচে ঢালাই করা অসম্ভব—কেবল খোদাই (chi es eled) করে তবেই তাকে কোনও আকার দেওয়া যায়। কিন্তু নব্যপ্রস্তর যুগে মানুষ নরম কাদা-মাটি ছাঁচে ঢালাই করে নানারকম বাসনপত্র তৈরি করেছে। কাজেই এক অর্থে (যদিও ঠিক নয়) কাদা মাটিকেও প্লাস্টিক বলা যায়। ধাতুর যুগ শুরু হলে মানুষ কিভাবে বহুবিধ ধাতব বস্তু যেমন, তামা, ব্রোঞ্জ, এবং লোহাকে ঢালাই (mold) করতে শিখল তা এখন আমাদের অজানা নয়। এর থেকে যন্ত্রপাতি ও ব্যবহারের অন্যান্য উপকরণও তৈরি করা গেল। সব শেষে তৈরি হল গ্লাস, সিমেন্ট, কংক্রীট, প্লাস্টার এবং রাবার।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকেই রসায়নবিদ্, পদার্থবিদ্ এবং এঞ্জিনিয়ারের দল আধুনিক বিজ্ঞানের প্রযুক্তি-কৌশল কাজে লাগিয়ে জৈব-পদার্থ থেকে নানা ধরনের প্লাস্টিক উৎপন্ন করতে সক্ষম হলেন।

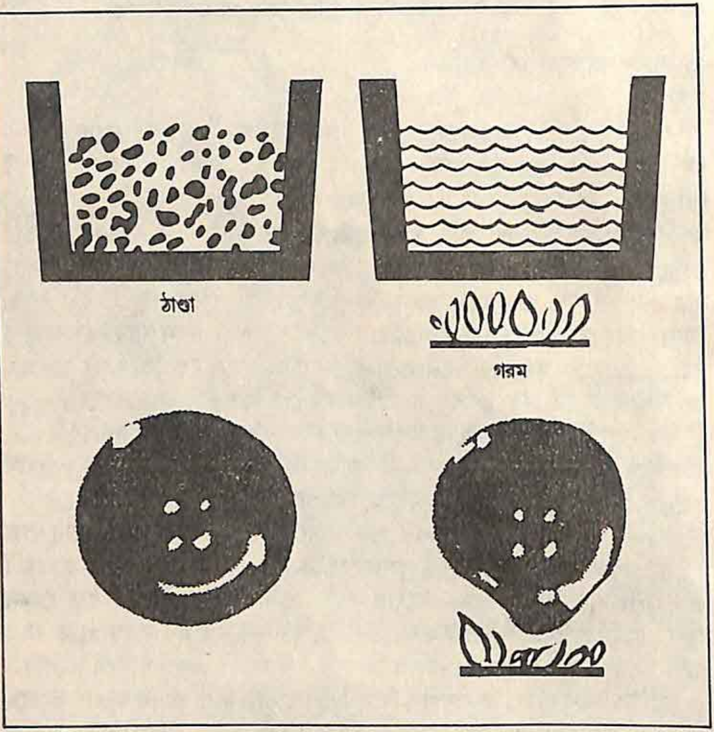
আগেই বলা হয়েছে প্লাস্টিকের অর্থ হলো যা ছাঁচে ঢালাই করে তৈরি করা যায়। কাজেই সব প্লাস্টিককেই খুশীমতো নমনীয় (moldable) করা যায়। কিন্তু মনে রাখতে হবে—সব নমনীয় বস্তুই প্লাস্টিক নয়—অজৈব বস্তু যেমন কাদা, গ্লাস, কংক্রীট, নানারকম ধাতু—এরা প্লাস্টিক শিল্পের মধ্যে পড়ে না। এমন কি রাবারও নয়। তবে রাবার নিশ্চয়ই পলিমার—একথায় পরে আসছি।

প্লাস্টিক জৈব রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে তৈরি। তার মধ্যে কার্বন ছাড়াও রয়েছে আরও অনেকগুলি মৌলিক পদার্থ। এই মৌলিক পদার্থ যেমন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ক্লোরিন এবং ফ্লুরিন কার্বনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্লাস্টিকের অতিকায় অণু গঠন করে। সাধারণ রেজিন দ্রব্যের (Resin) সঙ্গে প্লাস্টিকের সাদৃশ্য থাকায় অনেক সময় একে সিনথেটিক রেজিনও বলা হয়। এই রেজিন পীতাভ তৈল-স্ফটিকের মতো (amber) অথবা চাঁচ-গালা (Shellac) ইত্যাদির ন্যায় অনেকটা চটচটে আঠাজাতীয় পদার্থ।

সিনথেটিক প্লাস্টিক রেজিনের মধ্যে এ্যালকিড, ফেনোলিক এবং ভিনাইল রেজিন খুবই উল্লেখযোগ্য।

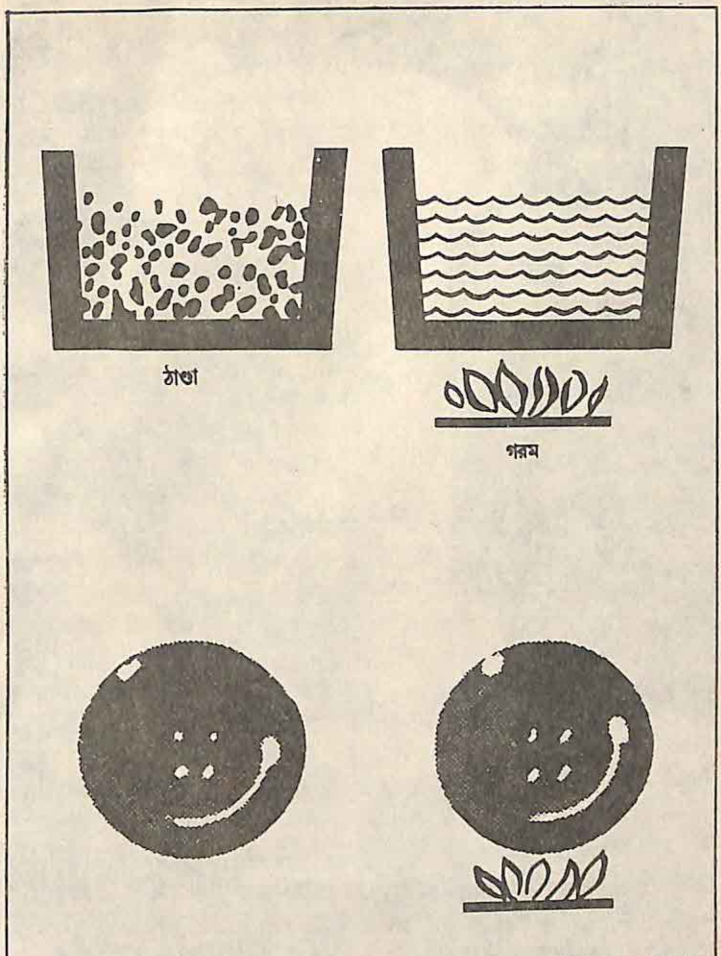
প্লাস্টিকের শ্রেণী বিভাগ—থার্মোপ্লাস্টিক ও থার্মোসেটিং

সমস্ত প্লাস্টিককেই দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে—থার্মোপ্লাস্টিক এবং থার্মোসেটিং। তাপের প্রভাবে এদের আচরণের পার্থক্যের জন্যই এই নাম। থার্মোপ্লাস্টিক বস্তুগুলি তাপের প্রভাবে নরম হয়ে যায়, এবং ঠাণ্ডা হলে শক্ত



থার্মোপ্লাস্টিক

হয়। যদি এই শক্ত থার্মোপ্লাস্টিক জিনিসকে আবার তাপ দেওয়া যায়—তাহলে সেটা আবার নরম হবে। এই নরম থার্মোপ্লাস্টিক বস্তুকে প্রয়োজন মাফিক আগের আকারে অথবা ইচ্ছামতো বিভিন্ন আকার দেওয়া যেতে পারে। এখানে বস্তুর ভৌতিক পরিবর্তন ঘটছে—রাসায়নিক পরিবর্তন নয়। প্রকৃতিতে অবশ্য এই ধরনের আরও অনেক বস্তু আছে যারা প্লাস্টিক নয় কিন্তু এরকম আচরণ করে থাকে। যেমন, মোম (Paraffin wax) ; থার্মোপ্লাস্টিকের মধ্যে পড়ছে

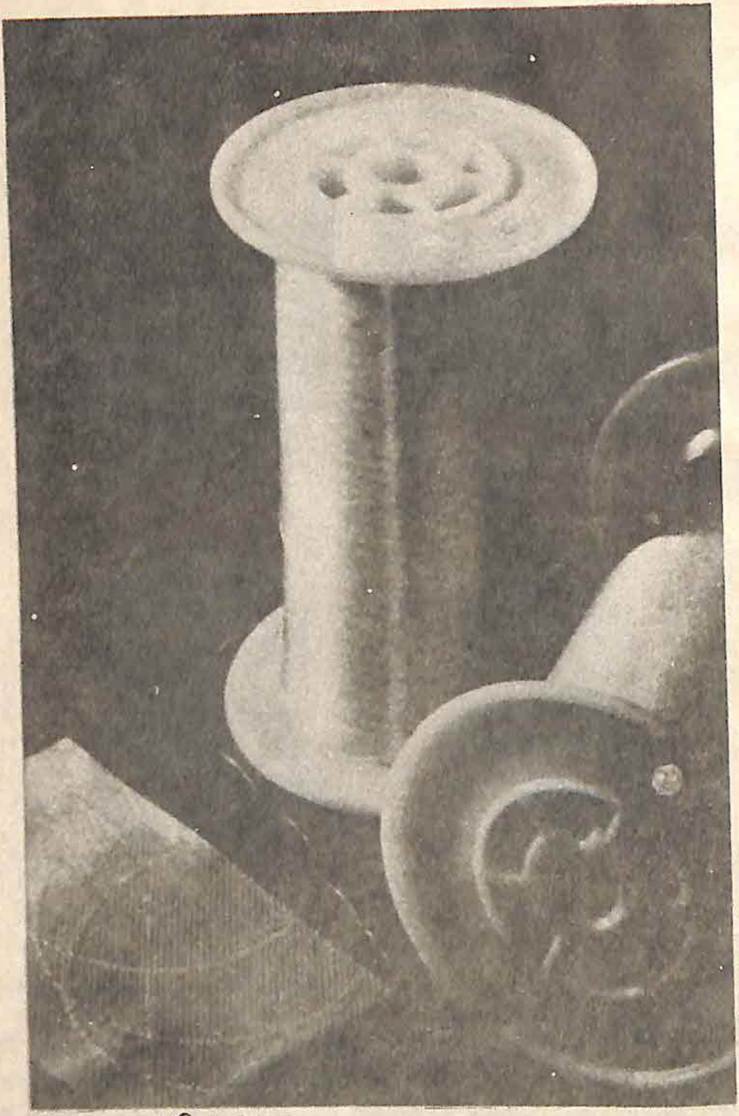


থার্মোসেটিং

পলিষ্টাইরিন এবং সেলুলোজ এসিটেট।

তাপের প্রভাবে থার্মোসেটিং প্লাস্টিকের আচরণ কিন্তু থার্মোপ্লাস্টিকের চাইতে বেশ আলাদা। তাপ প্রয়োগে থার্মোসেটিং প্লাস্টিক প্রথমে নরম হয়, তারপর থার্মোপ্লাস্টিকের মতোই শক্ত হয়ে যায়। কিন্তু আবার তাপ প্রয়োগ করে একে

Acc no - 14974



নতুন ধরণের ফ্লুরো-পলিমার Tefzel

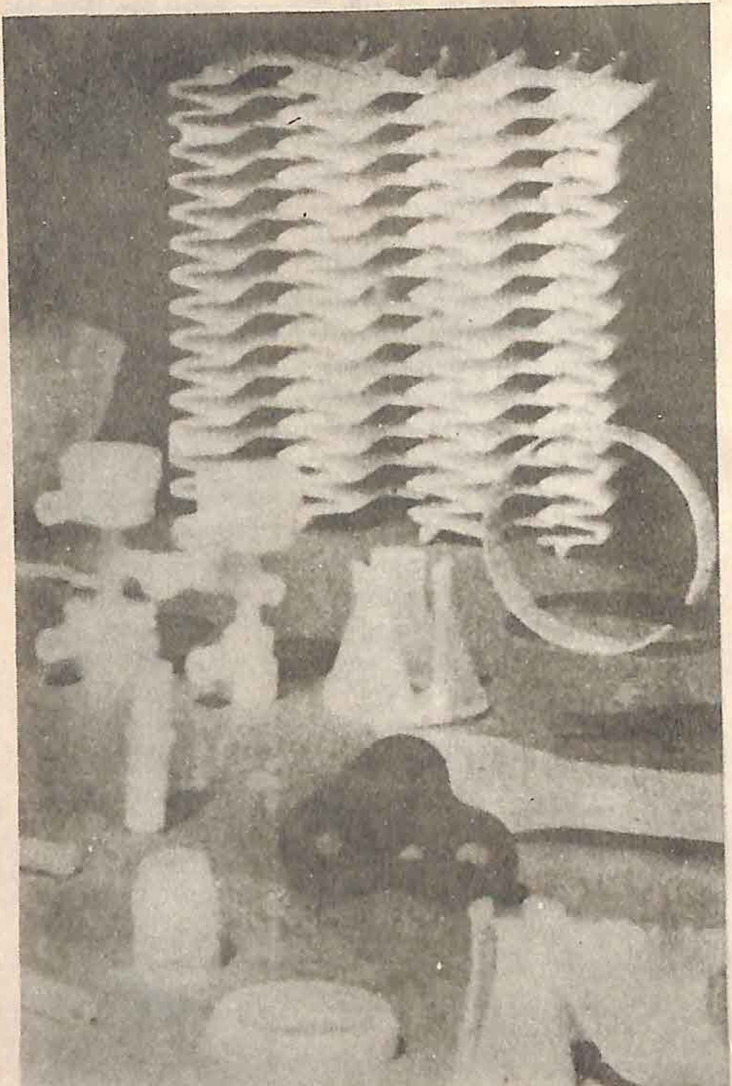
আর নরম করা যায় না। এই স্থায়ীভাবে শক্ত হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটিকে বলা হচ্ছে Curing এবং এটা একটা রাসায়নিক পরিবর্তনের ঘটনা। ডিমকে সেদ্ধ করলে যেমন তার ভিতরের কুসুম শক্ত হয়ে যায়, পরে অধিক তাপেও তা আর নরম হয় না থার্মোসেটিং-এর ঘটনাও অনেকটা সেইরকম। থার্মোসেটিং অথবা থার্মোসেটস এর মধ্যে পড়ছে ফেনোলিক এবং ইপক্সি প্লাস্টিক।

প্লাস্টিক তৈরীর মালমশলা

প্লাস্টিক তৈরির উপকরণের মালমশলাগুলি প্রকৃতি থেকে সরাসরি আহরণ করা যায় না। প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন, পেট্রোলিয়াম, ন্যাচারাল গ্যাস, কয়লা, চুণাপাথর, লবণ, ফ্লুরোস্পার, গন্ধক, জল, বাতাস ইত্যাদি থেকে সেগুলি উৎপাদন করে নিতে হয়। যদি আমরা কাউকে বলি, নাইলন তৈরি হয় কয়লা, গ্যাস এবং জল থেকে অথবা PVC (Polyvinyl Chloride) উৎপাদন করা হয় কয়লা, চুণাপাথর, লবণ এবং জল মিশিয়ে—তাহলে এ বক্তব্যের কোনও বৈজ্ঞানিক অর্থ হবে না। অবশ্য অনেক সময় খুব সহজ ভাবে সাধারণকে বুঝাবার জন্য ইচ্ছাকৃত ভাবে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সরলীকরণ করা হয়ে থাকে। এই বক্তব্যের অর্থ যেন ম্যাজিসিয়ান তাঁর টুপীতে ঘা দিয়ে ডিম ভেঙে নিমেষের মধ্যে একটা ওমলেট বানিয়ে ফেললেন। আসলে প্রাকৃতিক উপকরণগুলি থেকে প্রয়োজনীয় রাসায়নিক মালমশলায় রূপান্তর করার কাজটা বেশ জটিল এবং শ্রমসাধ্যও বটে। এই রাসায়নিক বস্তুগুলিকে প্লাস্টিক জাতীয় পদার্থে পরিণত করাও বেশ কঠিন। এর জন্য অতি আধুনিক যন্ত্র, দক্ষ বিজ্ঞানী, এঞ্জিনিয়ার, কুশলী টেকনিসিয়ান—এসবই চাই।

এখানে অল্প কথায় কি ভাবে মেলামিনফরম্যালডিহাইড রেজিন বস্তুর শিল্পোৎপাদন করা হয় তা আমরা আলোচনা করছি। মেলামিন তৈরি করতে চাই—কোক, লাইম এবং নাইট্রোজেন। একটা বৈদ্যুতিক চুল্লিতে লাইম এবং কোক উত্তপ্ত করলে ক্যালসিয়াম কারবাইড ও কার্বন-মনো-অক্সাইড উৎপন্ন হয়। এইবার এই ক্যালসিয়াম কার্বাইড আর একটি বৈদ্যুতিক উনুনে নাইট্রোজেন গ্যাস পাঠিয়ে উত্তপ্ত করলে ক্যালসিয়াম সাইনামাইড পাওয়া যায়। এই ক্যালসিয়াম সাইনামাইড জল ও অ্যাসিডের সংস্পর্শে এসে সাইনামাইড তৈরি করে। পরে সাইনামাইড থেকে ডাই-সাইনামাইড পাওয়া যায় ক্ষারের বিক্রিয়ায়। ডাই-সাইনামাইডকে অ্যামোনিয়া ও মিথাইলের সাহায্যে উত্তপ্ত করলে মেলামিন মেলে।

লাল তপ্ত কোক ও স্টীমের সংযোগ ঘটিয়ে হাইড্রোজেন এবং কার্বন-মনো-অক্সাইড তৈরি করা হয়। এই দুটো গ্যাসীয় পদার্থকে আবার ক্রোমিয়াম অক্সাইড



নানা ধরণের গ্লাস-রেইনফোর্সড প্লাস্টিকের জিনিষ

এবং জিঙ্ক অক্সাইড ক্যাটালিস্টের সংস্পর্শে এনে উচ্চ চাপ ও তাপ দিলে মিথানল (মিথাইল অ্যালকোহল) তৈরি হয়। এই মিথানল বাষ্প বাতাসের অক্সিজেনের সংযোগে উৎপন্ন করে ফরম্যালডিহাইড।

এইবার মেলামিন ও ফরমালডিহাইডকে একটা স্টেইনলেস স্টীলের কেটলিতে বিক্রিয়া ঘটিয়ে রেজিন জাতীয় বস্তুটি উৎপাদন করা হয়ে থাকে। এই কেটলিতে রয়েছে একটা ঘেঁটে দেবার যন্ত্র (agitator), তাপ দেবার জন্য স্টীম জ্যাকেট এবং তাপ নিরূপণ করবার জন্য একটা বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম। প্রথমে কেটলিতে ফরম্যালডিহাইড ঢেলে ওর মধ্যে মেলামিন ও কিছু ক্যাটালিস্ট সংযোগ করা হয়। মিশ্রণটি কিছুক্ষণ উত্তপ্ত করা দরকার এবং agitatorএর সাহায্যে ঘাঁটিয়ে পাম্প করে তরল রেজিন ফিল্টার করে নেওয়া হয়।

এই পরিশ্রুত রেজিন সালফাইট মণ্ডের সঙ্গে মিশিয়ে শুকিয়ে নিয়ে তার মধ্যে modifier দেওয়া প্রয়োজন। এই modifier এর সঙ্গে রঙিন দ্রব্য, লুব্রিকাণ্ট এবং ক্যাটালিস্টও থাকে। এবার এগুলি Ball mill-এ পিষে নিয়ে বাজারে ছাড়া হয় 'প্লাস্টিক মোল্ডিং পাউডার' হিসাবে।

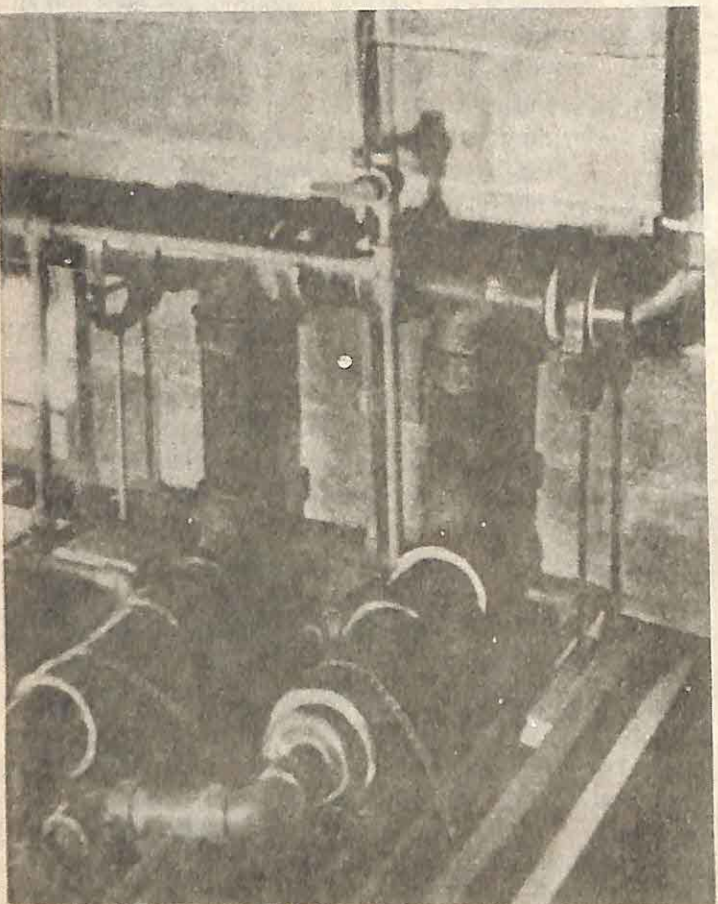
এছাড়া নমনীয়ক বা প্লাসটিসাইজার (Plasticizers) হচ্ছে প্লাস্টিক শিল্পের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বস্তু। এই প্লাসটিসাইজার প্লাস্টিকের নমনীয়তা (Flexibility) জল নিরোধক, প্রতিরোধ এবং আরও অনেক গুণাবলী বাড়িয়ে দেয়। বর্তমানে প্রায় চারশো রকমের জৈব যৌগিক পদার্থ প্লাসটিসাইজার হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। প্লাসটিকের দাহ্যতা, বৈদ্যুতিক ধর্ম ইত্যাদির পরিবর্তনও ঘটানো যায় এই প্লাসটিসাইজার সংযোগ করে।

পলিথিন

পলিইথিলিন নামের সঙ্গে এখন আমরা সবাই পরিচিত। ইথিলিন অণু তীব্র চাপে এবং তাপের প্রভাবে পরস্পর জুড়ে গিয়ে দীর্ঘ শৃংখলযুক্ত অতিকায় পলিইথিলিন অণু সৃষ্টি করে। এই পলিমার জলে ভিজে যায় না, অ্যাসিড বা ক্ষারে এর প্রতিক্রিয়াও কম এবং ভাল বৈদ্যুতিক অন্তরক (Insulator); বাজারে 'পলিথিন' নামে এটা কিনতে পাওয়া যায়। পলিথিন হচ্ছে থার্মোপ্লাস্টিক, একশো দশ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপে বেশ নরম হয়। তখন একে ছাঁচে ফেলে তার থেকে বোতল, সীট, পাইপ—এইসব সহজেই তৈরি করা যায়। কিছুদিন আগে পলিইথিলিন প্লাস্টিকের তৈরি সম্পূর্ণ মোটর লঞ্চ তৈরি হয়েছে—যা প্রায় ইস্পাতের মতোই টেকসই কিন্তু বেশ হাল্কা এবং তৈরি করতে খরচও পড়ে অনেক কম।

তেফলন

ইথিলিনের মতোই আর একটি জৈব-যৌগ টেট্রাফ্লুরোইথিলিনের পলিমারাইজেশনের ফলে তেফলন তৈরি করা যায়। বিভিন্ন রাসায়নিক বস্তুর সঙ্গে বিক্রিয়ায় এই তেফলন নিষ্ক্রিয় এবং অদাহ্য বস্তু। ইনসুলেটর হিসাবে এটাকে ব্যবহার করা হয়।



PVC (পলি ভিনাইল ক্লোরাইড) প্লাস্টিক পলিমার—আজকাল আকছার পাইপ এবং জল নিষ্কাসনের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে

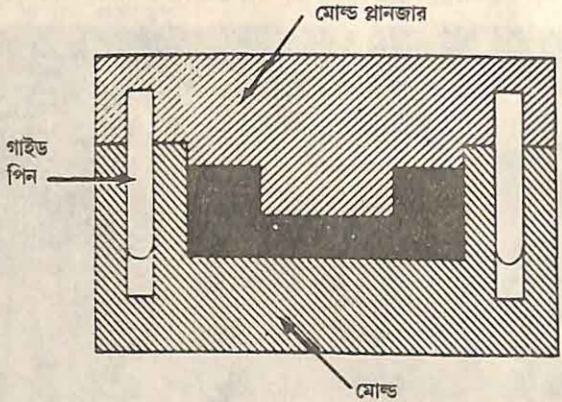
পলিস্টাইরিন

স্টাইরিনের পলিমার হলো পলিস্টাইরিন। কাঁচের ন্যায় স্বচ্ছ বলে কাঁচের বদলে এটাকে ব্যবহার করা হচ্ছে। কিন্তু কাঁচ যেমন সহজেই ভেঙে যায়, পলিস্টাইরিনের বেলায় কিন্তু সেরকম হয় না। রেডিও ও রাডার যন্ত্রে ইনসুলেটর

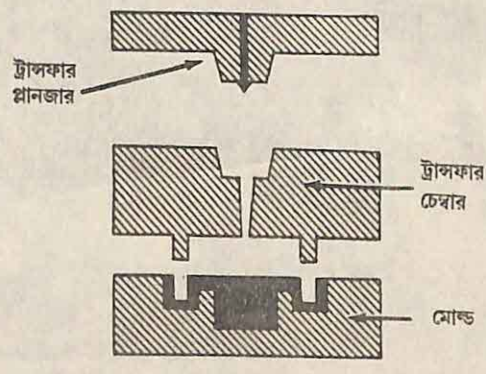


প্লাসটিকের ব্যাগ এখন খুবই ব্যবহৃত হচ্ছে। গাছের রস (tree-sap) সংগ্রহ করে তা অস্থায়ী ভাবে প্লাস্টিক ব্যাগে জমা রাখা হয়

কম্প্রেসন মোল্ডিং



ট্রান্সফার মোল্ডিং



হিসাবে মোটর গাড়ি এবং উড়োজাহাজের আলোর সরঞ্জাম হিসাবে পলিস্টাইরিনের বহুল ব্যবহার চলছে।

ভিনাইল ক্লোরাইড বহুগুণিতক হয়ে রেজিন জাতীয় বস্তুতে পরিণত হয়। জল দেবার হোস পাইপ, খাদ্যদ্রব্যের প্যাকেট, জলবৃষ্টি প্রতিরোধক কাপড়, পর্দা, তাঁবু এইসব তৈরি করতে পলিস্টাইরিন খুবই ব্যবহৃত হচ্ছে।

মিথাইল মিথাক্রিলেট হলো একটি বর্ণহীন তরল জৈব পদার্থ। পেরক্সাইড নামে এক ধরনের ক্যাটালিস্টের সংস্পর্শে এসে উত্তপ্ত অবস্থায় একপ্রকার রেজিনে পরিণত হয়। এই রেজিনও নিঃসন্দেহে পলিমার। এরোপ্লেনের জানালা, রোদ প্রতিরোধক চশমা প্রভৃতির জন্য কাচের বদলে এই প্লাস্টিক পলিমার ব্যবহৃত হয়।

এখানে একটা কথা মনে রাখা খুবই প্রয়োজন। সেটা হলো তেফলন, পলিস্টাইরিন, ভিনাইল ক্লোরাইড। মিথাইল মিথাক্রিলেট যে মনোমারগুলি থেকে উৎপন্ন হয়, তাদের প্রত্যেকের অণুর গঠনে ইথিলিন অণুর সাদৃশ্য আছে। ইথিলিনের একটা দুটো অথবা চারটে হাইড্রোজেন পরমাণু, অন্য পরমাণু অথবা কোনও মূলক দিয়ে প্রতিস্থাপিত করলে এই পলিমারগুলির মনোমার পাওয়া যায়।

প্লাস্টিক মোল্ডিং পাউডার

আগেই বলা হয়েছে যে, 'প্লাস্টিক মোল্ডিং পাউডার' হচ্ছে প্লাস্টিক জাতীয় বস্তু তৈরির উপকরণ। মাটিকে যেমন দলে নরম করে তারপর ছাঁচে ফেলে তার থেকে নানারকম মূর্তি, খেলনা এইসব তৈরি হয়, 'প্লাস্টিক মোল্ডিং পাউডার'কেও তেমনি মাটির সঙ্গে তুলনা করা যায়। প্লাস্টিকের দ্রব্যাদি তৈরি করতে গেলে যেসব পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে—কম্প্রেসন মোল্ডিং, ট্রান্সফার মোল্ডিং, ইঞ্জেকসন মোল্ডিং, ভ্যাকুয়াম মোল্ডিং ইত্যাদি।

কম্প্রেসন মোল্ডিং

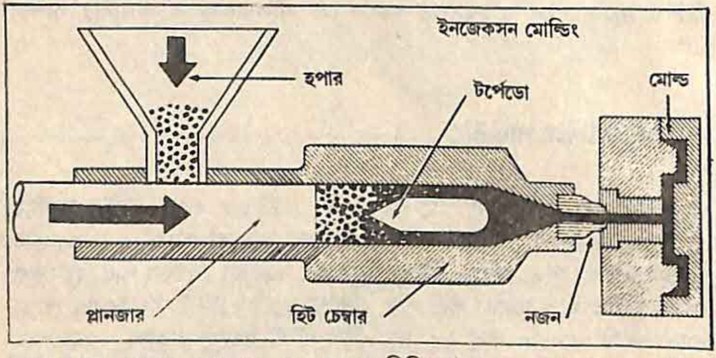
কম্প্রেসন মোল্ডিং পদ্ধতি অনুসৃত হয় থার্মোসেটিং জাতীয় প্লাস্টিক উপকরণ তৈরির বেলায়। প্লাস্টিক মোল্ডিং পাউডারকে প্রথমে উত্তপ্ত ছাঁচে ঢালা হয়। তারপর ঐ ছাঁচের মুখ হাইড্রোলিক প্রেস প্লাঞ্জার দিয়ে বন্ধ করে দিতে হবে। ছাঁচের অভ্যন্তরে প্লাস্টিক প্রথমে নরম হয়ে তারপর যথারীতি শক্ত হয়ে যাবে।

ট্রান্সফার মোল্ডিং

ট্রান্সফার মোল্ডিং অনেক কম্প্রেসন মোল্ডিং-এর মতোই। এই পদ্ধতিও থার্মোসেটিং জাতীয় প্লাস্টিক বস্তু তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়। প্লাস্টিক পাউডারকে প্রথমে একটা কক্ষে উত্তপ্ত করে নিতে হবে। এই কক্ষের নাম ট্রান্সফার চেম্বার। তারপর একটা প্লাঞ্জারের সাহায্যে ঐ নরম প্লাস্টিককে ট্রান্সফার চেম্বার থেকে ছাঁচের মধ্যে ঢুকতে বাধ্য করা হয়।

ইঞ্জেকসন মোল্ডিং

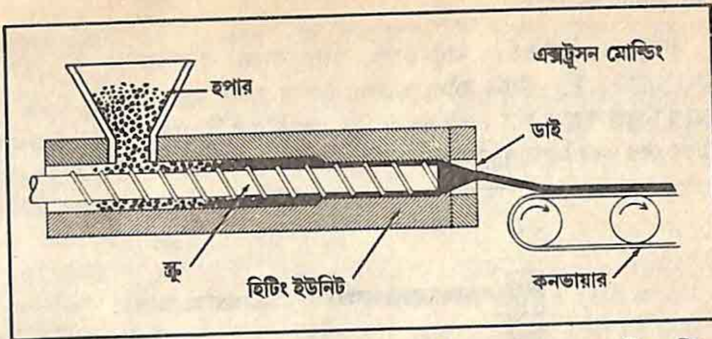
ইঞ্জেকসন মোল্ডিং ব্যবহৃত হয় থার্মোসেটিং জাতীয় প্লাস্টিক বস্তু তৈরিতে। প্লাস্টিকের জটিল অংশ তাড়াতাড়ি এবং সুচারুরূপে পেতে গেলে এই পদ্ধতি খুবই উপযোগী। এখানে ছাঁচের মধ্যে প্রায়ই পরস্পর সংযোগকারী নলের ভিতর অনেকগুলো গর্ত থাকবে। প্রত্যেক গর্তে এক একটি প্রয়োজনীয় অংশ তৈরি



হতে পারে, যেমন, বোতাম, স্ক্রু, অথবা ছিপি এই রকম আর কি। প্লাস্টিক পাউডার হপার থেকে উত্তপ্ত কক্ষের টর্পেডো অংশে পাঠানো হয়। তখন প্লাস্টিক গলে গিয়ে ছাঁচের মধ্যে প্রবেশ করে। এই তরল প্লাস্টিক ছাঁচের সমস্ত গর্তে পূর্ণ হয়। তারপর ঐ প্লাস্টিক ঠাণ্ডা ও কঠিন আকার প্রাপ্ত হলে ছাঁচ খুলে উৎপন্ন দ্রব্য সমূহ বের করে নিতে হবে।

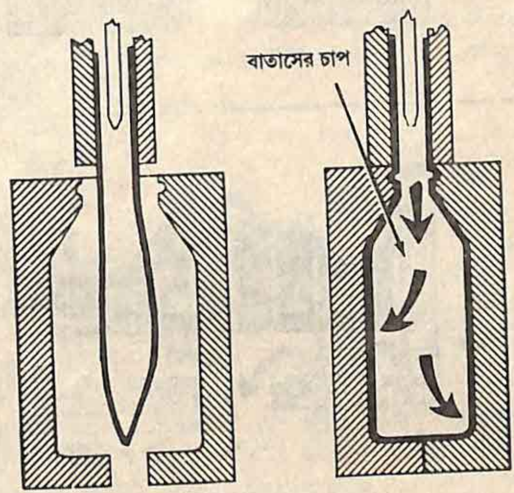
এক্সট্রুসন মোল্ডিং

প্লাস্টিকের চাদর, রড, পাইপ, টিউব এইসব তৈরি করতে Extrusion moulding পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। উত্তপ্ত প্লাসটিক মোল্ডিং পাউডার একটা ঘূর্ণায়মান স্ক্রু-এর সাহায্যে বাহিত হয়ে একটা ছিদ্রের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসে।



ঐ ছিদ্রের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে আসবার সময় ছিদ্রের আকার অনুযায়ী প্লাস্টিক সীট, রড অথবা পাইপ তৈরি হয়ে যাবে। এই সীট, রড ইত্যাদি বাতাসের সাহায্যে অথবা জলে ডুবিয়ে ঠাণ্ডা করা হয়ে থাকে।

ব্লো-মোল্ডিং

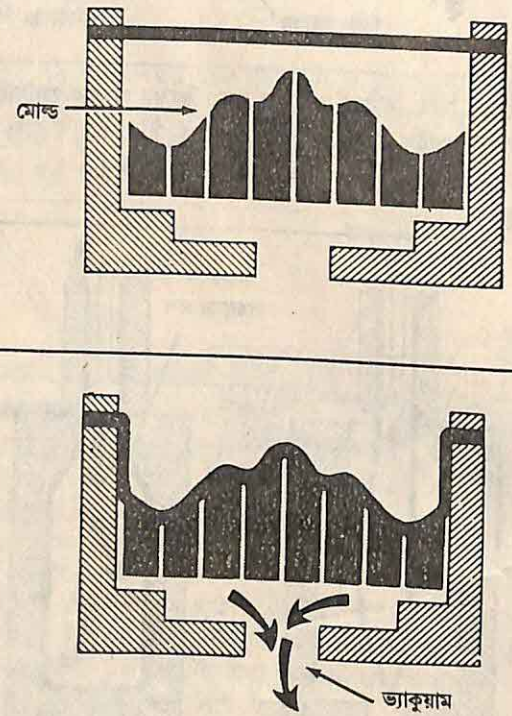


ব্লো-মোল্ডিং

ফাঁপা থার্মোপ্লাস্টিক দ্রব্যাদি তৈরি করতে ব্লো-মোল্ডিং পদ্ধতি অনুসৃত হয়। নমনীয় পলিথিন স্কুইজ কৌটো বা বোতল উৎপাদন করা হয় এইভাবে।

ভ্যাকুয়াম মোল্ডিং

ভ্যাকুয়াম মোল্ডিং-এ বায়ুমণ্ডলের চাপ কাজে লাগানো হয়। একটা থার্মোপ্লাস্টিক সীট ছাঁচের ফাঁপা অংশের উপরে পর্দার মত টান টান অবস্থায় রেখে উত্তপ্ত করতে হবে। তারপর ঐ সীট এবং ছাঁচের ভিতরের অংশের বাতাস টেনে বের করে নিলে বায়ুমণ্ডলের চাপে ঐ প্লাস্টিক সীট ছাঁচের ভিতরের অংশে



ভ্যাকুয়াম মোল্ডিং

ঢুকে পড়বে। পরে ঠাণ্ডা করে ঐ সদ্য উৎপন্ন প্লাস্টিক দ্রব্য সরিয়ে নেওয়া হয়।

ক্যালেণ্ডারিং-পদ্ধতিতে থার্মোপ্লাস্টিককে অনেকগুলি তপ্ত রোলারের মধ্যবর্তী

অংশের মধ্য দিয়ে চালান করে দিলে দেখা যাবে সীট অথবা ফিল্মের আকারে বেরিয়ে আসছে।

গলিত প্লাস্টিকের ভিতর দিয়ে গ্যাসের বুদবুদ পাঠিয়ে Foam প্লাস্টিক তৈরি করা হয়। যেসব প্লাস্টিকের ফোম তৈরি হয় তার মধ্যে রয়েছে সেলুলোজ অ্যাসিসেট, পলিইথিলিন, ভিনাইল, ইউরিথেন এবং সিলিকোন্‌স।

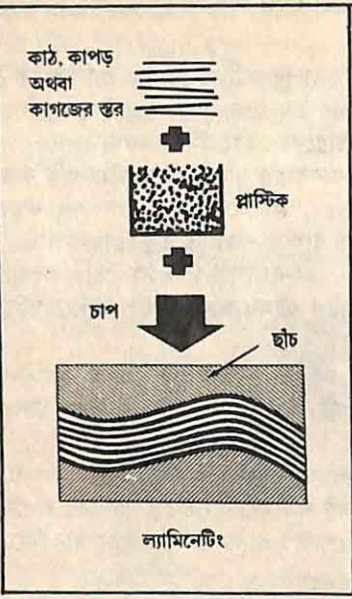
থার্মোসেটিং প্লাস্টিকের মধ্যে নানা ধরনের বস্তু ঢুকিয়ে তার শক্তি বৃদ্ধি করা যায়। এর নাম Reinforced plastic , প্লাস্টিকের মধ্যে যে সব বস্তুর অনুপ্রবেশ ঘটানো হয়ে থাকে তাদের মধ্যে রয়েছে—কাচের তন্তু (glass fibre) অ্যাসবেসটস, কাপড়, কাগজ—এইসব। রেইনফোর্সড প্লাসিটক তৈরি করবার জন্য প্লাস্টিকের সঙ্গে কাঁচতন্তু, অ্যাসবেসটস এইসব অনুপাত মত মিশিয়ে ছাঁচে ঢেলে চাপ প্রয়োগ করা দরকার।

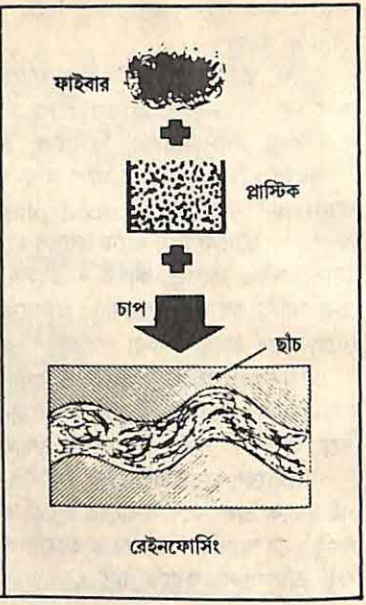
আজকাল বইয়ের মলাট, কাপড়, কাগজ ইত্যাদিতে প্রায়ই প্লাস্টিক ল্যামিনেসন দেখা যায়। এজন্য থার্মোসেটিং প্লাস্টিক দ্রবণ ঐ জিনিসের উপর দিয়ে তারপর তাপ ও চাপের সাহায্য নিতে হয়।

পলিমারের ব্যবহারিক ক্ষেত্র যেমনই ব্যাপক তেমনই অভিনব। কোট, প্যান্ট, টাই থেকে শুরু করে রাবারের জুতো সবই পলিমারের তৈরি। রাবারের কথায় একটু পরে আসছি। আপাতত আমাদের পোষাক-আশাকে পলিমারের স্থান নিয়ে কিছু আলোচনা করতে চাই।

নাইলন

নাইলনের মোজা, গেঞ্জি, ব্রাশ, দড়ি—এসব তো এখন হরদম ব্যবহৃত হচ্ছে। নাইলনে দুটি ভিন্ন মনোমার প্রথমে জুড়ে একটি নতুন বড় অণুর সৃষ্টি করে। আবার বৃহদাকার এই নতুন অণুর সঙ্গে প্রথমোক্ত মনোমার দুটির বিক্রিয়া ঘটে। তার ফলে বড় অণুটির দুই প্রান্তে ক্ষুদ্র মনোমারের অণু দুটি জুড়ে যায় এবং এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে থাকে। কাজেই নতুন বড় অণুটির কলেবর ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়। বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন ঘন-বহুগুণন বা Condensation polymerisation ; যে দুটি ভিন্ন মনোমার দিয়ে নাইলন পলিমার প্লাস্টিক তৈরি হয়, তাদের নাম হল—অ্যাডিপিক অ্যাসিড এবং হেক্সামেথিলিন- ডাই-অ্যামিন। হিসাব করে দেখা গেছে যে, পঞ্চাশটি অ্যাডিপিক অ্যাসিড ও পচ্চঞ্চাশটি হেক্সামেথিলিন- ডাই- অ্যামিনের অণুর ধারাবহিক বিন্যাসে নাইলনের একটি অতিকায় অণু গঠন করে। নাইলনের সুতো বেশ শক্ত এবং টেঁকেও অনেকদিন। জলে কাচবার একটু বাদেই নাইলনের কাপড়চোপড় শুকিয়ে যায়।


কাঠ, কাপড়
অথবা
কাগজের স্তর
প্লাস্টিক
চাপ
ছাঁচ
ল্যামিনেটিং


ফাইবার
প্লাস্টিক
চাপ
ছাঁচ
রেইনফোর্সিং


ক্যালেন্ডারিং পদ্ধতি
প্লাস্টিক সীট্ অথবা ফিল্ম

টেরিলিন ও ডেক্রন

টেরিলিন ও ডেক্রন পলি-ইস্টারে তৈরি জামাকাপড়ে তো আজকাল বাজার ছেয়ে গেছে। নাইলনের মত এরাও Condensation polymerisation পদ্ধতিতে তৈরি হয়—এদের ভিন্ন মনোমার দুটির নাম হচ্ছে গ্লাইকল ও টেরিহ্যালিক অ্যাসিড। গ্লাইকল হচ্ছে এক ধরনের অ্যালকোহল। অ্যালকোহল ও অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় ইস্টার তৈরি হয়। কাজেই এদের সাধারণ নামকরণ করা হয়েছে—পলিইস্টার। এই পলিইস্টার থেকে যে তন্তু পাওয়া যায়, তার নাম পলিইস্টার ফাইবার (Polyester fibre)।

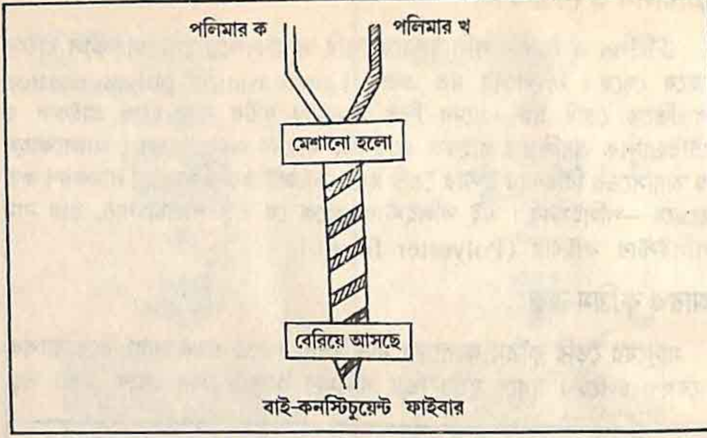
আরও কৃত্রিম তন্তু

মানুষের তৈরি কৃত্রিম কাপড়ের মান উন্নত করতে এখন সারা বিশ্বে ব্যাপক গবেষণা চলছে। দ্রবণে দুটো ভিন্ন পলিমার মিশিয়ে তার থেকে নতুন তন্তু



বাই—কম্পোনেন্ট ফাইবার

পাওয়া যায়। যেমন, নাইলন ও অ্যাক্রিলিন পলিমার মিশিয়ে তার থেকে যে নতুন সূক্ষ্ম তন্তু পাওয়া যায় তার নাম bi-component fibre; কিন্‌খনাইলনকে ডেক্রনের সঙ্গে মিশিয়ে bi-component fibre তৈরি করা



যায় না। এছাড়া দুটো পলিমার দ্রবণ একসঙ্গে মিশিয়ে (যেমন ৩০% পলিইস্টার, ৭০% পলিঅ্যামাইড) bi-constituent fibre পাওয়া যায়। আজকাল Blended filament-ও তৈরি হচ্ছে প্রচুর, এটা তৈরি করতে ঝামেলাও কম।



যেমন, দুটো ভিন্ন পলিমারের তন্তু কঠিন অবস্থায় পেঁচিয়ে অথবা একটা তন্তুর মধ্যে আর একটা চালান করে দিয়ে সহজেই কৃত্রিম ব্লেণ্ডেড ফিলামেন্ট তৈরি হচ্ছে। এই উন্নত পলিমার বস্ত্রশিল্পে এক যুগান্তর এনেছে।

রাবার

রাবার টানলে বাড়ে, যেদিকে খুশী দুমড়ানো যায় এবং দীর্ঘস্থায়ী। আমাদের দৈনন্দিন প্রায় প্রতিটি কার্যকলাপের সঙ্গে এই জিনিষটা জড়িয়ে আছে। রাবার কাজ করে আজ্ঞাধীন ভৃত্যের মতন। জুতোর তলার জন্য রাবারকে শক্ত করা যায় আবার বালিশের গদির জন্য নরম করাও চলে। খেলাধূলার সাজসরঞ্জাম, অস্ত্রোপচারের দস্তানা, বাচ্চাদের দুধ খাবার চুষি, চিরুণী, তোমাদের পেন্সিলের দাগ তোলার জন্য রাবার, ইলেকট্রিকের কাজ—কি না হচ্ছে এই রাবার দিয়ে। রাবার না থাকলে টেলিভিসন, টেলিফোন, রেডিও মোটর গাড়ী, কোনও কিছুরই সুযোগ নেওয়া সম্ভবপর হত না। রাবার আবিষ্কার হয়েছে বলেই তো আমরা বিজলী-তার নিরাপদে নাড়াচাড়া করতে পারি।

প্রথম রাবার আবিষ্কার ও নামকরণ

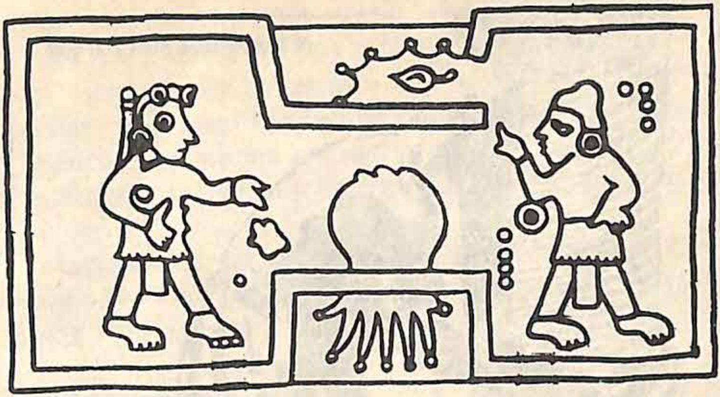
সব কিছুরই প্রথম আবিষ্কারের একটা গৌরব আছে। সে হিসাবে রাবার আবিষ্কারের গৌরবমাল্য জুটবে নিশ্চয়ই স্পেনবাসীদের। স্পেনের লোকেরা প্রথমে মেক্সিকোতে গিয়ে সেখানকার অধিবাসীদের একপ্রকার কালো রংয়ের বল নিয়ে খেলতে দেখেন। তাঁরা অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন যে বলটি মাটিতে পড়া মাত্র লাফিয়ে উঠে আসে। স্পেনের কৌতূহলী লোকেরা অনুসন্ধান করে জানতে পারলেন যে বলটি এক ধরনের গাছের আঠা থেকে তৈরী। জিনিষটা তাঁদের কাছে সম্পূর্ণ নতুন বলেই মনে হলো। তাঁরা এই গাছের কিছু আঠা ইউরোপে নিয়ে যান। পরে প্রিস্টলে নামে একজন প্রখ্যাত রসায়নবিজ্ঞানী রাবারের পেন্সিলের দাগ তুলবার গুণ আবিষ্কার করেন। আর সেই সময় থেকেই এই জিনিষটির নাম হয়—'রাবার'।

চিকিৎসা বিজ্ঞান এবং যাদুর খেলায় রাবার

চিকিৎসা বিজ্ঞান এবং যাদুর খেলা দেখাতেও একসময় এই রাবারকে ব্যবহার করা হয়েছে। মেক্সিকোরা প্রাচীনকালে এই রাবারের নাম দিয়েছিলেন—'OLLIN' ; এই অলিনের সাহায্যে এক ধরনের রং তৈরী করে সেটা দিয়ে কাগজে ছবি আঁকা হত। পরে ঐ ছবিটা পুড়িয়ে ফেলা হত। লোকে ভাবত, এর ফলে অসুস্থ ব্যক্তি সেরে উঠবে এবং ঈশ্বরের করুণা লাভ করবে। শোনা যায়, প্রাচীন যুগে গলার কর্কশ স্বর রাবার চিবিয়ে খেলে সেরে যায় বলে অনেকে মনে করত। তখনকার দিনে লোকেদের বিশ্বাস ছিল কোকো পানীয়র সাথে রাবার মিশিয়ে খেলে যক্ষ্মারোগ সেরে যায়। এ ছাড়া জোলাপ হিসাবে



রাবার গাছের বন



রাবার আহার করলে পাকস্থলীর রোগ সেরে যাবে বলে অনেকে এটাকে ওষুধ হিসাবেও সেবন করত।

তখন পর্যন্ত রাবারকে কেউ প্রয়োজনীয় বস্তু হিসাবে গণ্য করতে পারেনি—কেন না তখনও এটা ব্যবহারিক জীবনে অপরিহার্য বস্তু হিসাবে স্থান পায়নি। কাজেই বাজারে এর দাম একেবারে ছিল না বললেই হয়। এর পর ইউরোপে আর আমেরিকার বড় বড় রসায়ন, পণ্ডিতগণ রাবারের জল শোষণ নিরোধ গুণ উদ্ভাবন করেন, আর সঙ্গে সঙ্গে বাজারে এর দাম বেড়ে গেল। সাধারণ রাবার (raw rubber) যা প্রথমে সংগৃহীত হয়, তা বিশেষ কোন কাজে আসে না। তাই এটাকে শক্ত করবার প্রয়োজন বোধ হল। কিন্তু শক্ত করে দেখা গেল যে, এর স্বাভাবিক ধর্ম নষ্ট হয়ে গিয়েছে। বিজ্ঞানীদের একটা চিন্তার বিষয় হল—কি করে রাবারকে তার স্বাভাবিক ধর্ম রক্ষা করে কাজে লাগাতে পারা যায়। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে থমাস হ্যানকক নামে একজন ইংরাজ একটা হাতে তৈরী যন্ত্র আবিষ্কার করেন। এই যন্ত্রের সাহায্যে শক্ত রাবারকে নমনীয় করা যেত। হ্যানকক এই যন্ত্রটি পেটেণ্ট করেননি এবং তাঁর আবিষ্কার প্রায় তের বৎসর গোপন রেখেছিলেন।

রাবার দ্রবণ আবিষ্কার

হ্যানকক রাবারকে টারপেনটাইন তেলে গুলে একটা পাতলা দ্রবণ তৈরী করতেন। তাঁর হাতে তৈরী যন্ত্রটি আবিষ্কারের পর তিনি দেখলেন—ঐ যন্ত্রের সাহায্যে নমনীয় রাবার খুব সহজেই টারপেনটাইন তেলে গুলে একটা পুরু দ্রবণ তৈরী করতে পারে যেটা খুবই কাজে আসে।



ভাল্‌কানাইজেসন পদ্ধতি আবিষ্কার

এরপর ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে চার্লস গুডইয়ার নামে একজন আমেরিকান আবিষ্কার করলেন 'ভাল্‌কানাইজেসন' করলে রাবারের ধর্মের বিশেষ পরিবর্তন হয় যার ফলে এটাকে স্বাভাবিক তাপেই নাড়াচাড়া করা চলে এবং টেঁকেও বেশী দিন। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে থমাস হ্যানককও অবশ্য বৃটেনে এই একই পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন।

গুডইয়ার ছিলেন ফিলাডেলফিয়ার একজন ব্যবসায়ী। অল্প বয়স থেকেই তিনি রাবারকে এমনভাবে তৈরী করতে চেয়েছিলেন, যাতে ওটা ঠাণ্ডা বা গরমে টেঁকসই হয়। কিন্তু রসায়ন বিদ্যা তাঁর জানা ছিল না। রাবারের সঙ্গে এটা ওটা মিশিয়ে তিনি পরীক্ষা করতেন—অবশ্য জানতেন না তার ফল কি হবে।

একদিন তিনি রাবারের আঠার সাথে গন্ধক মিশিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। মিশ্রিত জিনিষ খানিকটা পড়ে গেল একটা গরম স্টোভের উপর। তিনি অবাক হয়ে দেখলেন যে গরম স্টোভের উপর পড়েও ওটা গলে গেল না। এইভাবে গুডইয়ার এতদিন ধরে যা চাচ্ছিলেন, হঠাৎ তা পেয়ে গেলেন। সালফার মিশানো এই রাবারের নাম ভালকানাইজ রাবার আর এই পদ্ধতিকে বলে 'ভাল্‌কানাইজেসন'। খুব ঠাণ্ডায় এই রাবার শক্তও হয় না বা খুব গরমেও গলে যায় না।

গুডইয়ারের এই আবিষ্কার রাবার সম্বন্ধে মানুষকে সজাগ করে তুলল। অন্যান্য অনেক রাসায়নিক পদার্থ বা তার সংমিশ্রণ যা রাবারকে ভালকানাইজ করতে পারে তা আবিষ্কৃত হল।

রাবার—দৈত্যাকার অণু

এই রাবার বস্তুটি আসলে কি ? কোথা থেকে আসে ? এর উত্তর যদি কোনও রাসায়নিকের কাছে চাওয়া যায় তাহলে তিনি বলবেন—এটা মনোমার নামক রাসায়নিক অণুর সংযোজনে তৈরী একরকম দৈত্যাকার অণু। টানলে এদের শৃংখল বাড়ে আবার ছেড়ে দিলে স্প্রিংয়ের মতো গুটিয়ে আসে। ল্যাবরেটরীতে টেস্টটিউবে এটা তৈরী করা যায়।

মানুষের তৈরী এই রাবার অবশ্য অল্পদিনের আবিষ্কার। প্রাকৃতিক রাবার যা রাবারের গাছ থেকে পাওয়া যায় সেটা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মানুষ জানতে পারে।

প্রাকৃতিক রাবার

হিভিয়া নামে একরকম বুনো গাছ জন্মায় আমাজন নদী উপত্যকায় এবং এই ধরনের গাছের অন্য প্রজাতি পাওয়া যায় পশ্চিম আফ্রিকায়। এখানে রাবার



রাবারের তৈরী নানা ধরনের সামগ্রী

গাছের বন হয়ে আছে কিন্তু শতকরা নব্বইভাগ প্রাকৃতিক রাবার আসে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে। এখানে রাবার গাছের চাষ হয়। রাবার গাছ চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। এর পাতার রং গাঢ় সবুজ এবং সাত-আট ইঞ্চি লম্বা। উষ্ণপ্রধান জলবায়ুতে চল্লিশ বছর আঠা পাওয়া যেতে পারে। গাছের বয়স পাঁচ-ছয় বছর হলেই তার থেকে রাবার সংগ্রহ করা যায়।

প্রথম আবাদ

প্রথম যুগে রাবার পাওয়া যেত দক্ষিণ আমেরিকায়। সেখানকার উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু এই গাছের পক্ষে উপযুক্ত ছিল। কিন্তু রাবার গাছের সেই গভীর বন থেকে রাবার সংগ্রহ করা খুব সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল না। এদিকে রাবারের অনেক উপযোগিতা থাকায় তার চাহিদাও গেল বেড়ে। সেই জন্য ঐ গাছ অন্যত্র আবাদ করবারও প্রয়োজন দেখা দিল।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে স্যার হেনরী উইকম্যান লন্ডনের কিউ গার্ডেন্সের অনুরোধে বন্য রাবার গাছের কয়েক হাজার বীজ সংগ্রহ করে ব্রেজিল থেকে পাঠালেন। সেগুলি কিউ গার্ডেন্স কর্তৃপক্ষকে দেওয়া হল। এখানে বিশেষভাবে তৈরী গরম ঘরে বীজগুলো লাগানো হল। যে অল্প সংখ্যক চারা বেঁচে গেল সেগুলি তিনি ভারতে পাঠান কিন্তু ভারত সরকার নূতন স্কীমে অর্থ ব্যয় করতে রাজী না হওয়ায় চারাগুলিকে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে সিংহল ও পরে দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি দেশে পাঠানো হয়।

হেনরী নিকোলাস রিডলে ছিলেন সিঙাপুর গার্ডেন্স-এর ডিরেক্টর। সেটা ১৮৮৮ সালের কথা। রিডলে সাহেব মালয় উপদ্বীপে নিয়ে এলেন রাবার। তখনকার দিনে মালয়ের প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য ছিল কফি। রিডলে যখন রাবার চাষের কথা বললেন তখন সকলে তাঁকে হেসেই উড়িয়ে দিল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই এই 'পাগ্‌লা রিডলের' কথাটা লোকে বেশ বুঝতে পারল। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে রিডলে অবসর গ্রহণ করবার সময় দেখা গেল, মালয় রাবার তৈরীর অন্যতম প্রধান ক্ষেত্রে পুরিণত হয়েছে!

আজকাল সারা জগতের প্রাকৃতিক রাবারের শতকরা নব্বই ভাগ আসে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে।

গাছ থেকে কারখানায়

রাবারের আঠাকে ইংরাজীতে বলে Latex; এটা দেখতে দুধের মতন সাদা। রাবার গাছের রস ও তার দুধের মতো সাদা তরল আঠা (Latex) কিন্তু

এক জিনিষ নয়—সম্পূর্ণ আলাদা। একরকম বিশেষ ধরনের ধারালো ছুরি দিয়ে গাছের বাকলে খাঁজ কেটে—কতকটা আমাদের খেজুর গাছে রস সংগ্রহের মতন, রাবার গাছ থেকে রস বের করা হয়।

রাবার গাছের আঠা সংগ্রহের পাত্রটিকে খুব ভোরে গিয়ে খুলে আনা দরকার ; কারণ বেলা বাড়লে আঠা খুব সহজে আর বেরোয় না। আঠা সংগ্রহের পাত্রটিতে অল্প কয়েক ফোঁটা এ্যামোনিয়া দেওয়া থাকলে রাবারের আঠা সহজে জমে না। তারপর ঐ আঠা কারখানায় এনে কাঁচা রাবারে পরিণত করা হয়। এই আঠার সঙ্গে পাতলা এ্যাসেটিক এ্যাসিড বা সালফিউরিক এ্যাসিড দ্রবণ মিশালে ওটা স্পঞ্জের মতন হয়। তারপর ওটাকে বিশেষ পাত্রে ঢেলে কেকের মতন করা হয়। এই রাবারকে রোলারে পিষে, শুকিয়ে সীটে পরিণত করে চালান দেওয়া চলে। রাবার গাছের ছাল এমনভাবে ঢালু করে কাটা হয় যাতে আঠা নীচের দিকে পড়তে পারে এবং সংগ্রহ করতেও সুবিধা হয়।

রাবারের চাষ বিশেষ কষ্টসাধ্য নয়। ছোট ছোট রাবার চারাগুলি পনের-কুড়ি ফুট অন্তর লাগাতে হয়। অবশ্য চারা লাগানোর আগে জমিকে জলশূন্য করতে হবে। চারা একবার মাটিতে ভালভাবে লেগে গেলে জমির আগাছা ইত্যাদি পরিষ্কার করা ছাড়া আর কিছু করার দরকার হয় না।

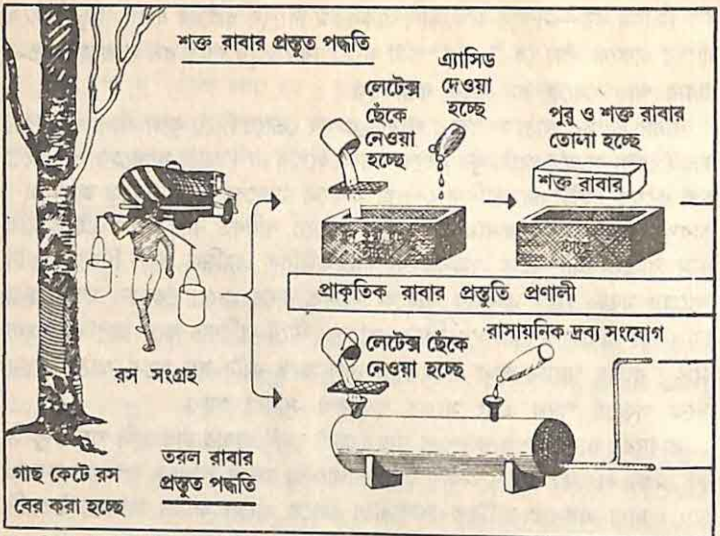
সিনথেটিক রাবার

প্রাকৃতিক রাবার ছাড়াও বিজ্ঞানীরা ল্যাবরেটরীতে কৃত্রিম উপায়ে রাবার তৈরী করতে পেরেছেন। এই সিনথেটিক বা কৃত্রিম রাবার বৃক্ষজাত রাবারের চাইতে অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ।

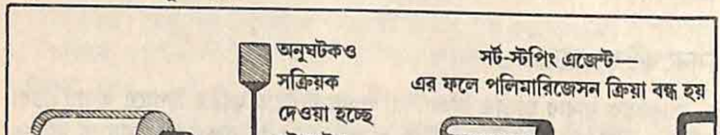
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে প্রাকৃতিক রাবারের কোন প্রতিযোগিতা ছিল না। তখন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াই ছিল প্রাকৃতিক রাবারের একমাত্র বড় সরবরাহ ক্ষেত্র। কিন্তু ১৯৩৯ সালের কাছাকাছি এই অঞ্চল থেকে প্রাকৃতিক রাবার সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। সেই জন্য পশ্চিম দেশগুলি নিজেদের জন্য রাবার তৈরীর প্রয়োজন বোধ করে। আর এর ফলেই হয় সিনথেটিক রাবারের সূত্রপাত।

সম্ভবতঃ প্রথম সিনথেটিক রাবার ল্যাবরেটরীতে তৈরী হয়েছিল 'বুটাডাইন' ও 'স্টাইরিণ' নামক দুটি রাসায়নিক পদার্থের সংযোগে। যখন এই রাসায়নিক পদার্থ দুটির সংমিশ্রণ একটি সাবান জলের পাত্রে ঢালা হয় তখনই বুটাডাইন ও স্টাইরিণের হাজার হাজার অণু পরস্পর সংযুক্ত হয়ে অণুকণাগুলি দীর্ঘ শৃংখলের মতো আকার নেয়। এর ফলেই সৃষ্টি হয় দানবাকার বড় একটা অণু।

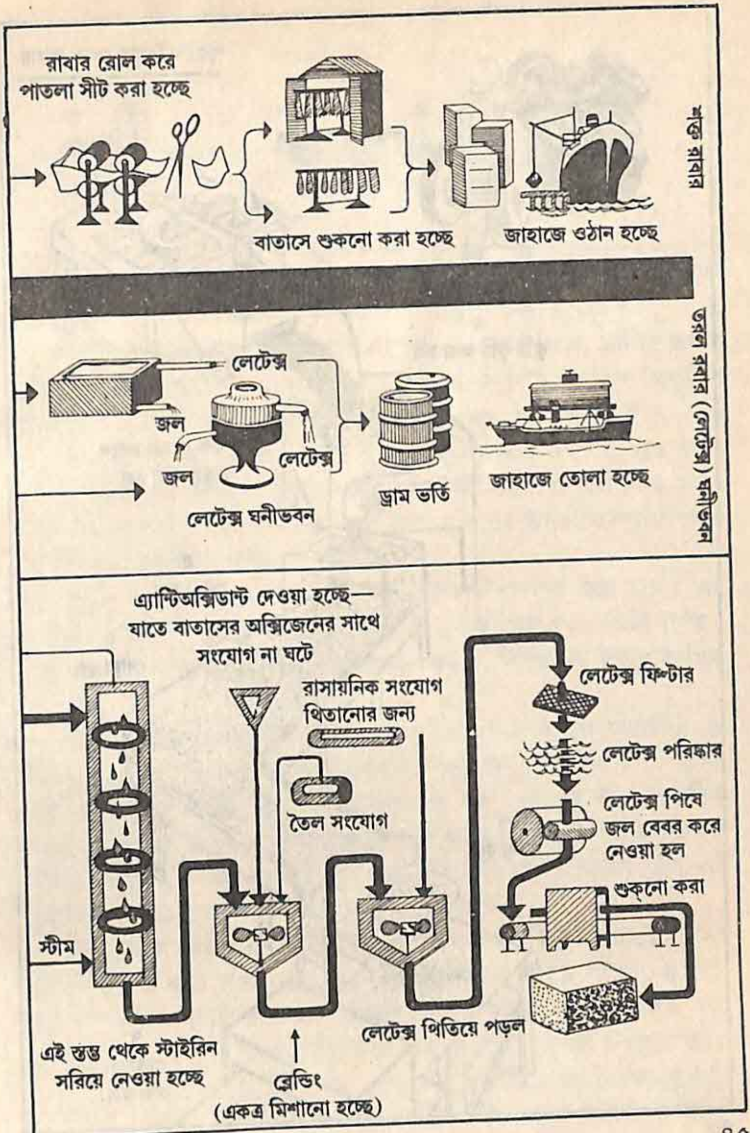
অলিফিন এবং পলিসালফাইড নামক পদার্থদ্বয়ের সংমিশ্রণে তৈরী হয়

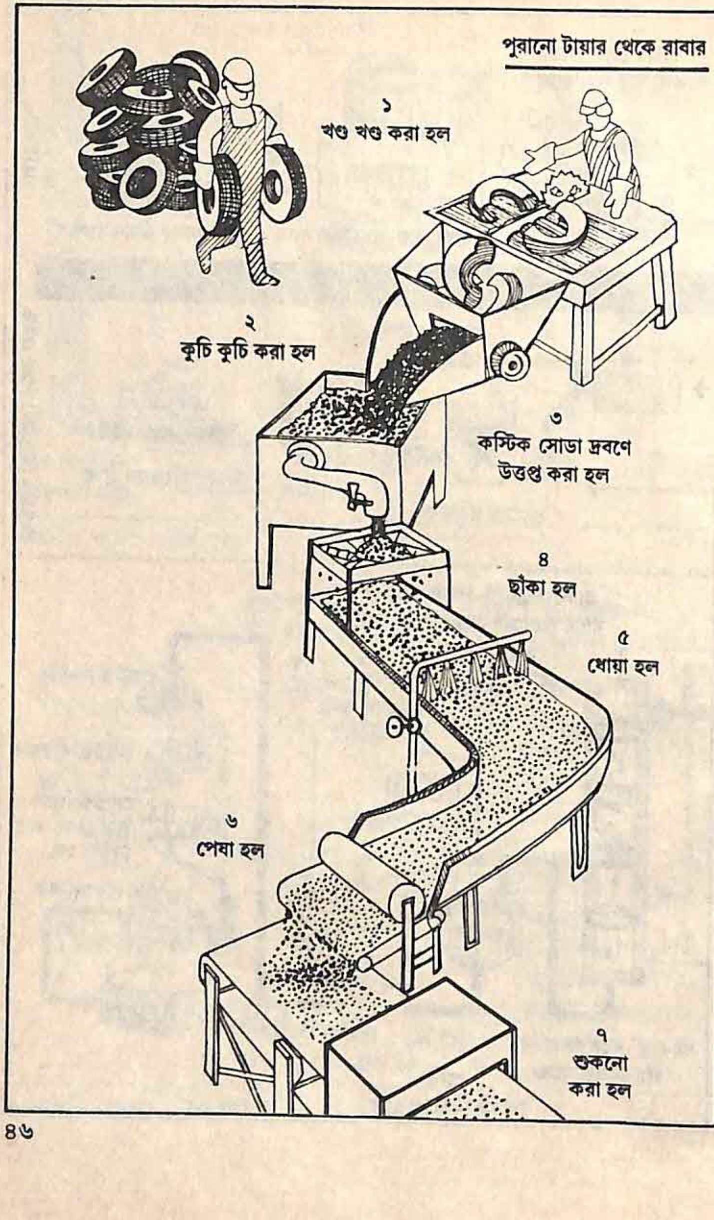


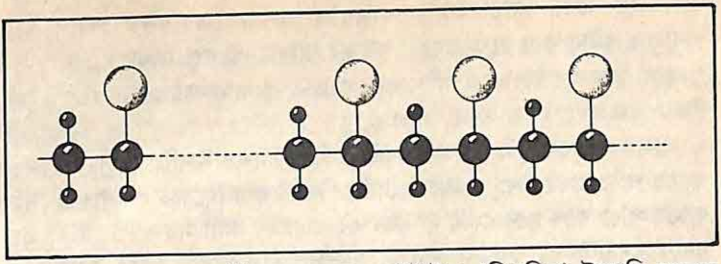
প্রাকৃতিক রাবার প্রস্তুত পদ্ধতি



সিনথেটিক রাবার প্রস্তুত পদ্ধতি


রাবার রোল করে
পাতলা সীট করা হচ্ছে
বাতাসে শুকনো করা হচ্ছে
জাহাজে ওঠান হচ্ছে
শক্ত রাবার
লেটেক্স
জল
জল
লেটেক্স
লেটেক্স ঘনীভবন
ড্রাম ভর্তি
জাহাজে তোলা হচ্ছে
তরল রবার (লেটেক্স) ঘনীভবন
এ্যান্টিঅক্সিডান্ট দেওয়া হচ্ছে—
যাতে বাতাসের অক্সিজেনের সাথে
সংযোগ না ঘটে
রাসায়নিক সংযোগ
থিতানোর জন্য
তৈল সংযোগ
লেটেক্স ফিল্টার
লেটেক্স পরিষ্কার
লেটেক্স পিষে
জল বেবর করে
নেওয়া হল
শুক্‌নো করা
স্টীম
এই স্তম্ভ থেকে স্টাইরিন
সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে
ব্লেন্ডিং
(একত্র মিশানো হচ্ছে)
লেটেক্স থিতিয়ে পড়ল


পুরানো টায়ার থেকে রাবার
১
খণ্ড খণ্ড করা হল
২
কুচি কুচি করা হল
৩
কস্টিক সোডা দ্রবণে
উত্তপ্ত করা হল
৪
ছাঁকা হল
৫
ধোয়া হল
৬
পেষা হল
৭
শুকনো
করা হল



থিওকল রাবার। পরবর্তীকালে অবশ্য নাইট্রাইল, 'নিওপ্রিন' ইত্যাদি অনেক উন্নত ধরনের কৃত্রিম রাবার ল্যাবরেটরীতে প্রস্তুত করা হয়েছে।

এই সব কৃত্রিম রাবারের বিশেষ গুণ এই যে, এটা কোন তেল, এ্যাসিড অথবা যে-কোন তরল পদার্থে বিকৃত হয় না ; অথবা জলবায়ু, সূর্যতাপ প্রভৃতির ভারতম্যের ফলেও সহজে এর কোন পরিবর্তন দেখা যায় না। এই সব গুণ প্রাকৃতিক রাবারে না থাকায় আমাদের অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। থিওকল প্রাকৃতিক রাবারের মতো অতটা শক্তিশালী নয় এবং এটা নিয়ে কঠিন রাবার তৈরী করা যায় না। চামড়া এবং অন্যান্য ধাতুর উপর প্রলেপ দেওয়ার কাজেই এর ব্যবহার বেশী।

সম্ভবতঃ সিলিকোন রাবারই সবরকম উষ্ণতায় ব্যবহার করা যায়। এই রাবারের সহ্যশক্তি—১৩০ ডিগ্রী ফারেনহাইট থেকে প্রায় ৫০০ ডিগ্রী পর্যন্ত। উচ্চতাপ সহ্য করতে হয় যে সব জায়গায় সেখানে সিলিকোন রাবার ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

পুরানো রাবারের অব্যবহার্য টায়ার এবং রাবারের অন্য অনেক ফেলে দেওয়া জিনিষ থেকে আবার নতুন করে রাবার তৈরী করা যায়। এর থেকে যে রাবার পাওয়া যায় সেটা তৈরী করতে যে শুধুমাত্র খরচ কম পড়ে যাই নয়—প্রাকৃতিক অথবা সিনথেটিক রাবারের সাথে এটা অনুপাত মতো মিশিয়ে উৎপন্ন রাবারজাত বস্তুটির ধর্মকে খুশীমতো নিয়ন্ত্রণ করা চলে। জুতোর 'সোল' অথবা 'হিল' এই অব্যবহার্য রাবার থেকেই উৎপন্ন করা হয়ে থাকে।

বাজে, ফেলে দেওয়া রাবারকে তৈল জাতীয় দ্রবণে ডুবিয়ে উচ্চচাপে স্টীমের সাহায্যে উত্তপ্ত করে তার থেকে নতুন রাবার পাওয়া যেতে পারে। এ ছাড়া মার্কের পদ্ধতি অনুযায়ী অব্যবহার্য রাবারকে ক্ষার জাতীয় দ্রবণে ডুবিয়ে, ধুয়ে শুকিয়ে নিয়ে পুনরায় ভালকানাইজেসন করলে নতুন রাবার উৎপন্ন হয়।

রাবারকে খুশীমতো রং করা যায়। রাবারের মধ্যে যে সমস্ত উপাদান ঢুকিয়ে একে রঙ্গীন করা হয় সেগুলো হচ্ছে অজৈব আয়রন অক্সাইড, এ্যান্টিমনি

সালফাইড এবং ক্যাডমিয়াম। আজকাল অবশ্য জৈব-রঞ্জক পদার্থ দিয়ে রাবারকে রঙ্গীন করা হয়ে থাকে। অজৈব রাসায়নিক বস্তু যেখানে প্রায় ৫-১০ শতাংশ দিতে হয় রাবারকে রঙ্গীন করবার জন্য সেখানে শতকরা এক ভাগ জৈব রঞ্জক বস্তু দিয়েই এ কাজ সারা যায়।

রাবার সাধারণত বিদ্যুৎ অপরিবাহী। কিন্তু বিশেষ উপায়ে বিদ্যুত-পরিবহণ করতে পারে এমন রাবারও ল্যাবরেটারিতে তৈরী করা গিয়েছে। বিদ্যুৎ পরিবহণ করতে পারে বলে মনে কোর না যেন এই রাবারের অন্য সব ধর্মগুলো নষ্ট হয়ে যায়। মোটেই তা হয় না—বরং সেগুলো ভালভাবেই বজায় থাকে।

আয়ন বিনিময়কারী রেজিন

জল-পরিশোধন করবার জন্য আজকাল ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে আয়ন-বিনিময়কারী রেজিন (Ion- exchange resin)। এই সব রেজিনের সাহায্যে জল থেকে সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম ইত্যাদি ধাতব অণুদের দূর করা যায়। কাজের অনুপযোগী হয়ে উঠলে এইসব রেজিনকেও আবার ব্যবহারোপযোগী করে তোলা সম্ভব।

সিলিকোনস

সিলিকোন্‌স এক নতুন ধরনের প্লাস্টিক পলিমার। এখানে অতিকায় অণুর দীর্ঘশৃংখলে কার্বনের বদলে থাকে মধ্যমণির মতো সিলিকন অণু। প্রায় সব সিলিকোনস্ পলিমারই অতি উচ্চ তাপ অথবা খুব নিম্ন তাপ সহ্য করার ক্ষমতা রাখে, রাসায়নিকভাবে নিষ্ক্রিয় তো বটেই। এই তাপ প্রতিরোধ ক্ষমতার জন্য সিলিকোনস্ পলিমারকে প্রেসার কুকারের ‘গ্যাসকেট’ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। অনেক সিলিকোনস্‌কে রাবারের মতো ভালকানাইজড্ করা যায়। গ্রীজ, লুব্রিকাণ্ট, পেইণ্ট, ভার্নিস এবং জল-নিরোধক বস্তু হিসাবে এদের বহুল ব্যবহার রয়েছে। বেকারীতে রুটি তৈরির প্যানে সিলিকোনস্ প্রলেপ থাকলে তাতে রুটি আটকে যেতে পারে না। সিলিকোন তেল এরোপ্লেনের এঞ্জিনের যন্ত্রাংশে দেওয়ার কাজে ব্যবহার করা হয়—কেননা এখানে দ্রুত উষ্ণতার পরিবর্তন ঘটে।

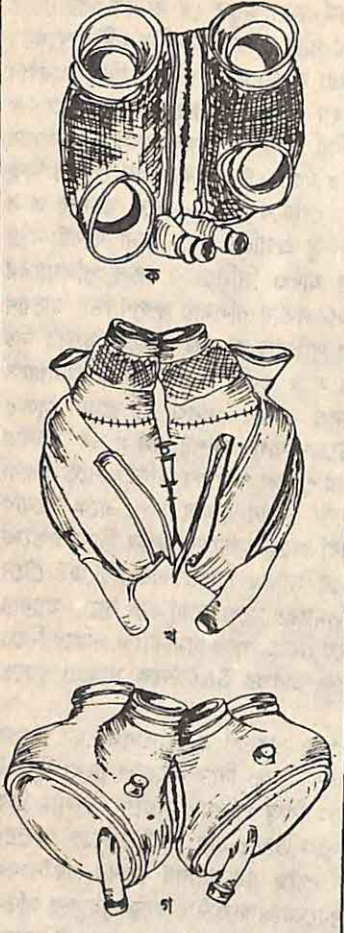
ডাইমিথাইল-ডাই-ক্লোরোসিলেন ও মিথাইল-ট্রাইক্লোরোসিলেন সম আনবিক অনুপাতে জলের সঙ্গে মিশিয়ে তৈরি হয় সিলিকোন রেজিন। এই অতিকায় অণুর পলিমারে কয়েক হাজার সিলিকন পরমাণু থাকতে পারে। ইনসুলেটর, জল নিরোধক পালিশ ও ভার্নিস প্রস্তুত করতে সিলিকোন রেজিন আজকাল খুবই ব্যবহৃত হচ্ছে। সিলিকোন রেজিনে রাবারের মত স্থিতিস্থাপকতা ধর্ম দেখা যায়।

পলিমারের ধর্ম

অনেক পলিমারের আচার আচরণ ও ধর্ম এমন অদ্ভুত যে, অবাক হয়ে যেতে হয়। পলিমারের এই অদ্ভুত আচরণ তাদের গঠন ও অণুর নমনীয় সুদীর্ঘ শৃংখলে পারস্পরিক আকর্ষণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়। ময়দায় জল দিয়ে তারপর সেটাকে দলে চটকে নরম তাল করা হয়। দলে চটকানোর সময় ময়দার (প্রাকৃতিক পলিমার, শ্বেতসার বা স্টার্চ) দীর্ঘ আণবিক শৃংখল আলগা হয়ে যায় এবং জলের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। আবার মজা এই যে, আণবিক শৃংখল কিছু পরে গুটিয়ে এলে জল ছিদ্র দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে—ফলে ময়দার তাল ফুলে ওঠে। ময়দার এই তাল নমনীয়, কিন্তু প্রবাহিত হবার জন্য যথেষ্ট সান্দ্র (Viscous) নয়। ময়দার তালের সঙ্গে যদিও সিলিকোন তেল পলিমারের কিছুটা সাদৃশ্য রয়েছে, তবু সিলিকোন তেল-জাতীয় পলিমার সম্পূর্ণ ভিন্ন আচরণ করে। ছুঁড়ে দিলে এই সিলিকোন তেলের পলিমার কখনও রাবারের বলের মত ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে, কখনও আবার সান্দ্র তরল পদার্থের ন্যায় অনায়াসে প্রবাহিত হতে পারে। এই রকম কখনও সান্দ্র, কখনও বা রাবার সুলভ স্থিতিস্থাপক আচরণ পলিমারের এক উল্লেখযোগ্য বিশিষ্ট ধর্ম। এই ঘটনার সূত্রপাত হয় তখনই, যখন অসংখ্য পলিমার শৃংখল পরস্পর জড়িয়ে পড়ে। এরা যেন পরস্পর কুণ্ডলী জড়ানো অনেকগুলো কেঁচো অথবা সাপ, একে অন্যের গায়ে জড়াজড়ি করে আছে। কখনও এরা অন্যের গায়ের উপর দিয়ে এগুচ্ছে কখনও বা নিজেদের গুটিয়ে নিয়ে পিছিয়ে আসছে। স্প্রীং-এর মত এই টেনে বড় হওয়া এবং গুটিয়ে আসা ধর্ম বহু পলিমারের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। ময়দার মধ্যে কিছুটা জল দিয়ে সেটাকে চামচ দিয়ে নেড়ে, পরে চামচটাকে সরিয়ে নিলে দেখা যাবে ঐ তরল বস্তু প্রথমে একদিকে তারপর উল্টোদিকে সামান্য ঘুরতে শুরু করেছে।

অনেক পলিমার দ্রবণের প্রবাহ আচরণও সাধারণ তরল পদার্থ যেন জলের চাইতে একদম আলাদা। জলের মধ্যে একটা দণ্ড দিয়ে নাড়ালে দেখা যায় ঐ দণ্ডের কাছে জলের পৃষ্ঠদেশ নিচের দিকে কিন্তু পলিমার দ্রবণের বেলায় ঠিক উল্টো। পলিমার দ্রবণ ঐ দণ্ডের উপর দিকে উঠতে চায়! এই দ্রবণকে কেন্দ্রের দিকে ঠেলে দেওয়ার কারণ কি? দেখা গেছে এই ব্যাসার্ধ বরাবর একটা বল (radial force) উৎপন্ন হয় পলিমার দ্রবণের এককেন্দ্রীয় বৃত্তে পরস্পর গতির জন্য। যেহেতু এককেন্দ্রীয় বৃত্তগুলি ভিন্ন গতিতে ঘুরতে থাকে—কাজেই তাদের পরস্পরের ঘর্ষণ এবং পলিমার শৃংখলের জটিল গঠন বৈচিত্র্যের ফলে ঐ তরল বস্তু কেন্দ্রের দিকে স্তূপাকৃত হয়ে জমতে শুরু করে।

কোনও টিউবের মধ্যে দিয়ে পলিমার দ্রবণ জোর করে ঠেলে পাঠালে ঐ দ্রবণ ফুলে-ফেঁপে উঠবে সম্ভবত তার আণবিক শৃংখল গুটিয়ে আসার দরুন। কখনও



(ক) ক্লিফোর্ড কিউয়ান-গেট নির্মিত কৃত্রিম হৃদয়
(খ) ডোমিঙ্গো লিওত্তা নির্মিত কৃত্রিম হৃদয়
(গ) রবার্ট জারভিক নির্মিত ৭ম কৃত্রিম হৃদয়



(ক) কলফ্ ও আকুৎসে নির্মিত কৃত্রিম হৃদয়।
(খ) কলফ্ দ্বারা নির্মিত রবারের কৃত্রিম হৃদয়
(গ) ইউকিহিকো নোসে নির্মিত কৃত্রিম হৃদয়
(ঘ) পরমাণুশক্তি চালিত কৃত্রিম হৃদয়

কখনও পলিমার দ্রবণের আয়তন পাঁচগুণ পর্যন্ত বেড়ে যেতে পারে এবং এই বিচ্ছিরি ব্যাপারটা ঘটে বিশেষ করে খুব সূক্ষ্ম কৃত্রিম পলিমার তন্তু (Synthectic fibre) উৎপাদনের সময়। এই সমস্যা এড়াতে যন্ত্র-কুশলীদের অনেক কৌশল অবলম্বন করতে হয়।

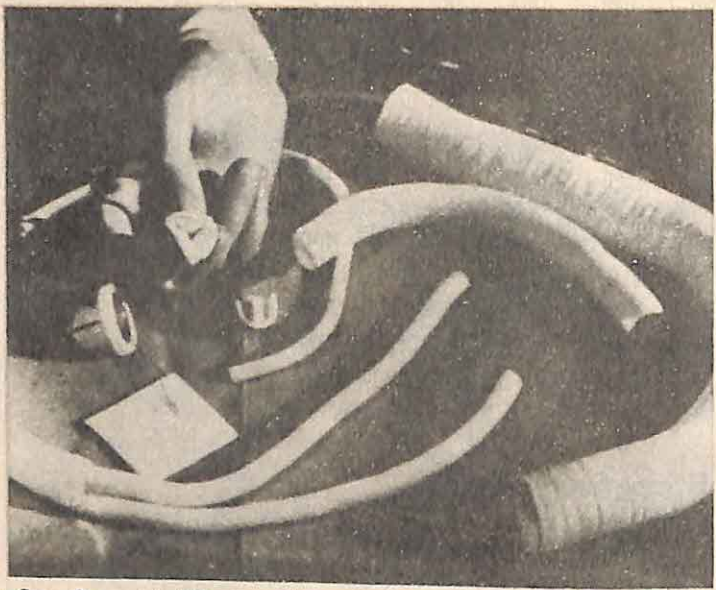
পলিমার দ্রবণের নিজে থেকেই সাইফন হবার ব্যাপারটিও দারুণ আশ্চর্যজনক। তরলের পৃষ্ঠদেশ সাইফন থেকে বেশ কয়েক সেন্টিমিটার দূরে থাকলেও চিন্তার কারণ নেই—পলিমার দ্রবণ সহজেই সাইফন হয়ে বেরিয়ে আসবে। এছাড়া সাধারণ তরলে অতি সামান্য পলিমার দ্রবণ মিলিয়ে দেখা গেছে যে ঐ তরলের আচরণ বদলে যাচ্ছে। জল দিয়ে আগুন নেভাবার সময় ঐ জলে সামান্য পলিইথিলিন অক্সাইড মিশিয়ে দেখা গেছে যে জলের জেট ভেঙে পড়ছে না এবং বেশ সুস্থিত হয়েছে। পলিওয়াটার বা পলিমার জলও বিজ্ঞানীরা তৈরী করে ফেলেছেন। এই পলিওয়াটার এবং পলিমার দ্রবণের অদ্ভুত আচরণ নিয়ে বিশ্বের বড় বড় দেশে এখন ব্যাপক গবেষণা চলছে।

চিকিৎসা বিজ্ঞানে পলিমার

প্লাসটিকের নানারকম খেলনা, প্লাস্টিকের গামলা-বালতি-গেলাস আরও কত কি আমরা দেখতে পাই। প্লাস্টিক সাজরী বলতেও আনাড়ী লোকে ভাববে, এটাও বুঝি অস্ত্রোপচার করে প্লাস্টিক জুড়ে দেবার ব্যাপার!

না, তা নয়। প্লাস্টিকের পাত যদি কোনও ক্ষতস্থানে জুড়ে দেওয়া যায়, তাহলে সেটা জ্যান্ত হবে কি করে? প্লাস্টিকের পাতে তো আর টিসু অথবা কোনও স্নায়ুমণ্ডলী নেই! রক্তধারা বইবে কিসের ভিতর দিয়ে? দেহের অন্য জায়গা থেকে জীবন্ত রক্তবহা স্নায়ুযুক্ত চামড়া এনে সুকৌশলে লাগিয়ে দিলে ক্ষতস্থানে ওটা জোড়া লেগে যাবে। অস্ত্রবিদ্যায় এই কৌশলটাই প্লাস্টিক সাজরী। সে যাই হোক, চিকিৎসা বিজ্ঞানে এই পলিমারের ব্যাপক ব্যবহার একটা যুগান্তর এনেছে। এমন কি আজকাল পলিমারের কৃত্রিম চামড়াও দেহে নিপুণভাবে জুড়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। এ কথায় পরে আসছি।

অপারেশন থিয়েটারের সার্জিক্যাল আলোর ঢাকনায় এখন কাঁচের বদলে লাগানো থাকে 'পলিথারিমাইড' নামে এক ধরনের উন্নত পলিমার—৩৪০ ডিগ্রী ফারেনহাইট তাপ সহ্য করতেও যে কুণ্ঠিত নয়। কোনও আধুনিক হাসপাতালে পলিমারের তৈরী নানারকম সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি অঢেল দেখতে পাওয়া যায়। অন্য দেশের কথা না হয় ছেড়ে দেওয়া গেল, খোদ আমেরিকাতেই এই ধরনের যন্ত্র তৈরী হচ্ছে বছরে প্রায় ৩০,০০০ টন। পলিমার সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি তৈরী করবার সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন ঐ পলিমারের বিষক্রিয়া (toxic) না



কৃত্রিম ধমনী এবং হার্টের চিকিৎসার নানা উপকরণ তৈরী হয়েছে প্লাস্টিক পলিমার থেকে

থাকে—এমন কি এর গায়ে কোনও দাগও পড়বে না। এছাড়া পলিমার বস্তুটি আস্বাদহীন এবং গন্ধহীন হবে তো বটেই। চিকিৎসা বিজ্ঞানে Sterilization সিসটেমের স্বচ্ছ প্লাস্টিক দ্রব্য তৈরী হচ্ছে পলিসালফোন দিয়ে। Vaginal Speculum, কৃত্রিম হার্ট, কৃত্রিম কিডনী, সাজরীর ব্লাড ফিল্টারের দ্রব্যাদি, স্টেথোস্কোপ, ব্লাড ব্যাগ, কৃত্রিম উপায়ে মূত্রাশয় থেকে মূত্র বের করে দেবার নল (catheter) এই রকম অসংখ্য অপরিহার্য ডাক্তারী-উপকরণ আজকাল পলিমার দিয়ে তৈরী হচ্ছে। উচ্চ তাপ-রোধ শক্তি, অতি স্বল্প জল শোষণ ক্ষমতা এবং দীর্ঘ স্থায়িত্বই হচ্ছে এইসব পলিমারের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

রক্তের লোহিত-কণিকার haemolysate পুরে দেওয়া হচ্ছে নাইলন পলিমারের তৈরী আংশিক ভেদ্য কৃত্রিম মাইক্রো-ক্যাপসিউলের ভিতর। পুড়ে যাওয়া রোগীর দেহে কৃত্রিম চামড়া বসিয়ে দেওয়াও এখন আর কোনও অসম্ভব ব্যাপার নয়। এই কৃত্রিম চামড়া প্রোটিন পলিমারের তৈরী, যা রোগীর দেহে জুড়ে দিতে হলে ঐ পলিমারের ০·০০০৫ ইঞ্চি পুরু ফিল্ম চাই। এই পাতলা ফিল্ম দুটো অ্যামিনো এ্যাসিডের সংযোগে গঠিত পলিমার এবং এর আণবিক ওজনও প্রায় ৫০,০০০ ; এটা নির্বীজিত (sterilise) করা যায় এবং প্রায় ২৭০

ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা সহ্য করবার শক্তি রাখে। এছাড়া আশা করে হচ্ছে হয়ত অদূর ভবিষ্যতে আরও জটিল fiologically active পলিমার প্রোটিন অণু তৈরী করা সম্ভব হবে।

বিকশিত-দণ্ত-রুচি-কৌমুদীর জন্য কৃত্রিম দাঁত তৈরীতেও প্লাস্টিক না হলে চলবে না। বৃটেনে কৃত্রিম দাঁতের প্রায় ৮৫% এখন প্লাস্টিক দিয়ে তৈরী হচ্ছে, আমেরিকায় শতকরা ৩০%। সম্প্রতি মনোমার প্রস্তুত এক ধরনের 'টিসু এ্যাডেসিভ' বাজারে এসেছে যা ক্ষতস্থানে স্প্রে করে ছড়িয়ে দিলে দেহের সাধারণ উষ্ণতায় তা পলিমার হয়ে রক্তপাত বন্ধ করবে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে—এই মনোমার মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই রক্তপাত বন্ধ করতে পারে। এই 'টিসু এ্যাডেসিভ' গ্যাস্ট্রোইনটেসটিনাল, renal/ pulmonery, vascular সাজরীর ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করে খুবই সুফল পাওয়া যায়।

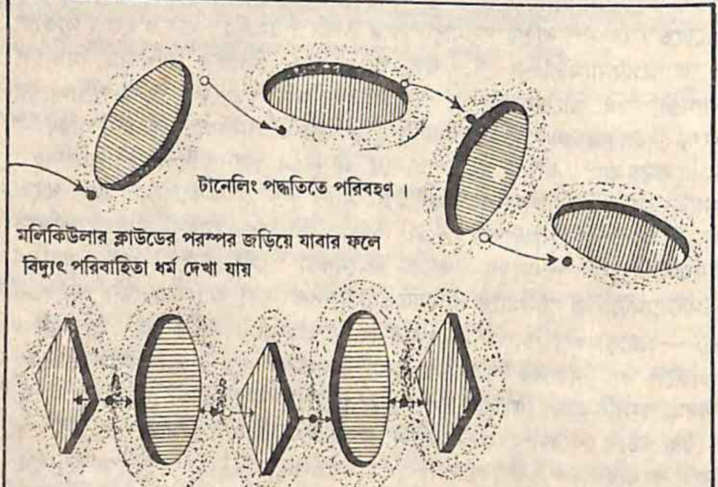
অর্গানোমেটালিক পলিমার

জৈব-ধাতু যুক্ত পলিমার (organometallic polymer) এবং পরিবাহী পলিমার (polymer semi conductor) বিজ্ঞানের নূতন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। কোনও ধাতুর পরমাণুর সঙ্গে কার্বন পরমাণুর সরাসরি যোগ থাকলে তাকে অর্গানোমেটালিক যৌগ বলা হয়। যেমন মিথাইল লিথিয়াম, মিথাইল ম্যাগনেশিয়াম আয়োডাইড বা টেট্রাইথাইল লেড ইত্যাদি। জৈব পলিমারের মধ্যে সেইরকম একটা ধাতুর পরমাণু জুড়ে দিয়ে ঐ পলিমারের আশ্চর্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। অনেক কাজে আসছে এই নতুন ধরনের বিস্ময়কর পলিমার। অর্গানোমেটালিক পলিমারে স্যাণ্ডউইচের মতো দুটো জৈব কাঠামোর মধ্যে থাকে ধাতুর পরমাণু। ঝিনুকের দুটো পাতার ভিতরে যেমন মুক্তো লুকিয়ে থাকে—ধাতুর পরমাণুও থাকে অনেকটা সেইভাবে। এই ধরনের অর্গানোমেটালিক পলিমারে বিস্ময়কর বৈদ্যুতিক এবং আলোকধর্মের পরিবর্তন ঘটে—এছাড়া তার তাপধারণ ক্ষমতারও উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে এই ধরনের পলিমার এখন অণুঘটক (catalyst) হিসাবে এবং ফারমাকোলজিক্যাল ক্রিয়াকলাপের জন্য রাতারাতি খ্যাতিমান হয়ে উঠেছে। গত কয়েক বছরে বিজ্ঞানীরা নতুন নতুন অর্গানোমেটালিক পলিমার ল্যাবরেটরীতে তৈরী করেছেন। পরীক্ষা করে দেখা গেছে পলিমারের মধ্যে ধাতুর পরমাণু যুক্ত হলে ঐ নতুন জৈব যৌগিক পদার্থের স্থায়িত্ব বহুগুণ বেড়ে যায়। এমন কি ধাতুর পরমাণু অথবা আয়ন (চার্জড কণা) যদি কাছাকাছি বিরাজ করে তাহলে এই পলিমারের বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা (conductivity) ঘটাও বিচিত্র নয়।

পলিমার সেমিকনণ্ডাকটর

পলিমারের পরিবাহিতা ধর্মের ব্যাপারটা যে খুব সাধারণ ঘটনা এমন নয়। বেশীর ভাগ পলিমারই ইনসুলেটর বা অপরিবাহী। যদিও কোনও কোনও ক্ষেত্রে পলিমার বস্তুর প্রশংসাযোগ্য পরিবাহিতা ধর্ম নজরে আসে। এই পলিমার নিজে অপরিবাহী কিন্তু নিয়ন্ত্রিত তাপের প্রভাবে এর থেকে এক ধরনের কালো বস্তু পাওয়া যায় যা বিদ্যুৎ পরিবহণ করতে পারে সহজেই। তাপের হেরফের ঘটিয়ে এই পলিমারের বিদ্যুৎ পরিবহণ ক্ষমতার রদবদল করাও এখন সম্ভব হয়েছে। পলিমার সেমিকনডাক্টর তাই বিজ্ঞান জগতে একজন নবীন আগন্তুক—নবযুগ তার যাত্রায় পথে উৎসুক ভাবে চেয়ে রয়েছে।

প্লাস্টিক জাতীয় পলিমারের এই আশ্চর্য বিদ্যুৎ পরিবহণ ক্ষমতা এবং প্রযুক্তি বিদ্যার কৌশল কাজে লাগিয়ে এখন ধাতুর পরিবর্তে পলিমার সেমিকনডাকটর ব্যবহার করা হচ্ছে। এমন দিন আসছে যখন দেখা যাবে পলিমার কনডাকটর পরিবাহী ধাতুকে একেবারে সরিয়ে প্রচণ্ড দাপটে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছে। বিজ্ঞানীদের স্থির বিশ্বাস ভবিষ্যতের বিশাল নয়া প্রযুক্তি বিদ্যা গড়ে উঠবে এই পলিমার সেমিকনডাকটরকে কেন্দ্র করেই। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় জানা গেছে যে যেসব পলিমার উচ্চ বিদ্যুৎ পরিবহণ ক্ষমতা সম্পন্ন তারা প্রায়ই অদ্রবণীয় হয়



জৈব সেমিকনডাকটরে কি ভাবে বিদ্যুত পরিবহণ হয় ছবিতে তা বুঝানো হয়েছে

এবং তাদের আণবিক ওজনও কম হয়ে থাকে। আর যে সমস্ত পলিমারের আণবিক ওজন খুব বেশী দেখা গেছে তাদের বিদ্যুৎ পরিবহণ করবার ক্ষমতা খুবই ক্ষীণ। আজকাল পলিমার থেকে চার্জ ট্রান্সফার কমপ্লেক্স সহজেই তৈরী করা যাচ্ছে। এই চার্জ ট্রান্সফার কমপ্লেক্সগুলির প্রায়ই উচ্চ বিদ্যুৎ পরিবাহিতা ধর্ম লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য জৈব মনোমারের নাম হলো TCNQ (টেট্রা সাইয়ানো কুইনো ডাই মিথেন)। এটি একটি জটিল রাসায়নিক বস্তু—যার বিদ্যুৎ পরিবাহিতা খুব বেশী। TCNQ মনোমার থেকে দীর্ঘ পলিমার শৃংখল তৈরী করা কঠিন নয় এবং শতকরা ১৫-২০ শতাংশ বেশী নিরপেক্ষ TCNQ থাকলে তখন ঐ পলিমারের পরিবহণ ক্ষমতা প্রায় কয়েক লক্ষ গুণ বেড়ে যায়। সিলিকন মাইক্রো-চিপস কম্পিউটার শিল্পে ব্যবহার করা হয়ে থাকে এবং এর জন্য প্রতি বৎসর বেশ মোটা টাকা বিনিয়োগ করার প্রয়োজন হয়। ভবিষ্যতে পলিমার সেমিকনডাকটর সিলিকন মাইক্রো-চিপসকে টেক্কা দিতে পারে কিনা সেটাই দেখার বিষয়।

ঠিক কি ভাবে প্লাস্টিক পলিমার বিদ্যুৎ পরিবাহী হয়ে ওঠে তা সহজ কথায় বলছি। এখানে ইলেকট্রন যেন মিউজিক্যাল চেয়ারের মতো এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ছুটে চলে—আর তার ফলেই বিদ্যুৎ পরিবহণ সহজ হয়।

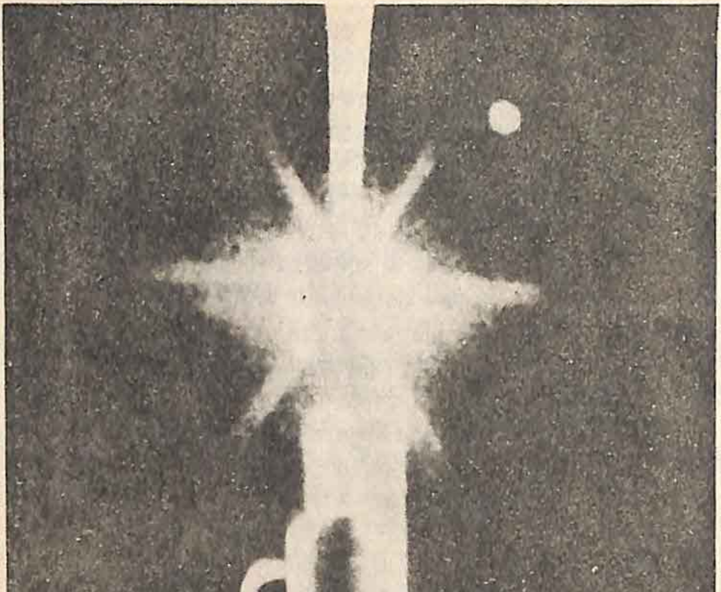
একমাত্রিক পরিবাহিতা

একধরনের পলিমারের একমাত্রিক পরিবাহিতা one dimensional conductivity) রয়েছে যেখানে বিদ্যুৎপ্রবাহ কেবলমাত্র আণবিক অক্ষের একদিকেই চলতে পারে। এই পলিমারগুলি ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতিতে অতি সুন্দরভাবে কাজ করতে পারে—এক্ষেত্রে ভুল দিকে বিদ্যুৎ প্রবাহ লিক করে যাওয়ার সম্ভাবনাও থাকে খুব কম।

মনোমারের চাইতে অর্গানোমেটালিক পলিমারের বাড়তি প্রতি-প্রভা (Flnoroscence) ধর্ম থাকায় আশা করা যাচ্ছে অদূর ভবিষ্যতে এদের লেসার-রশ্মি উৎপাদনে ব্যবহার করা যাবে।

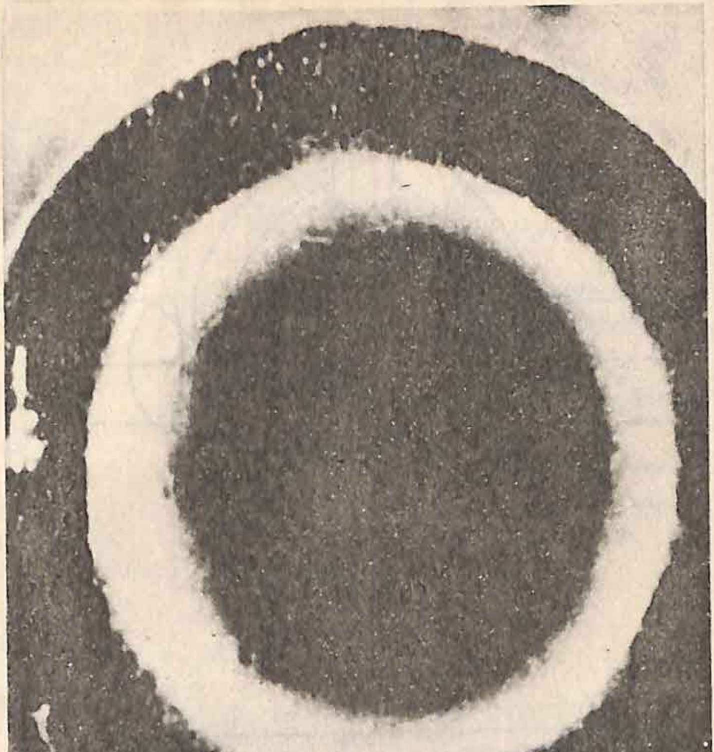
ফিউসন বিক্রিয়ায় পলিমার

তবে পলিমার একেবারে দুনিয়ার সকল জৈব বস্তুকে টেক্কা দিয়েছে ফিউসন বিক্রিয়ায় তাপ শোষক আধার হিসাবে। ডয়টেরিয়াম ও ট্রিটিয়াম (হাই ড্রোজেন আইসোটোপ এদের পরমাণুর ইলেকট্রন সংখ্যা এক, কিন্তু পারমাণবিক ওজন আলাদা) মিশ্রণ উচ্চ চাপে বদ্ধ একটা গোলাকার পাত্রে রেখে অতি তীব্র লেসার রশ্মি দিয়ে তার কেন্দ্রের জ্বালানীতে আঘাত করা হয়। নিউক্লিয়ার ফিউসন



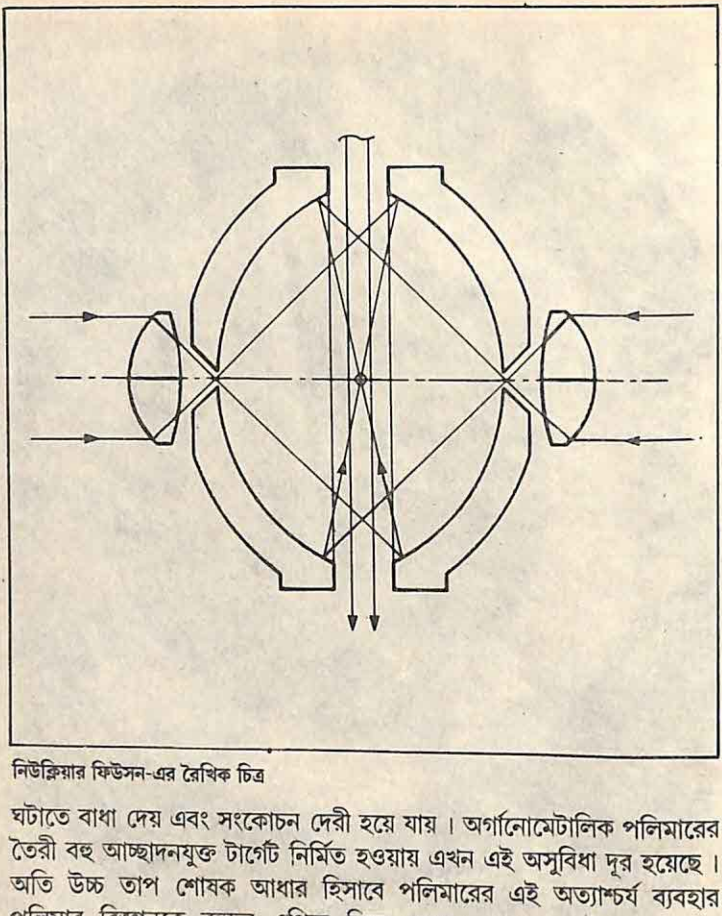
নিউক্লিয়ার ফিউসন প্রক্রিয়া এগিয়ে চলেছে

বিক্রিয়া ঘটে এবং যথারীতি হিলিয়াম ও প্রবলভাবে সক্রিয় নিউট্রন বেরিয়ে আসে। এই বেরিয়ে আসা নিউট্রন ঐ আধারের জালে আটকে ফেলে তার থেকে শক্তি উৎপাদন করা সম্ভব।



বহু আচ্ছাদনযুক্ত টার্গেটের ভিতরের ফাঁপা গোলাকার উচ্চ তাপ শোষক পলিমার আধার।
(এই পলিমার তৈরী হয়েছে অক্টাডেকাইল মিথাইল অ্যাক্রাইলেট থেকে।)

এই পদ্ধতি সুচারুভাবে সম্পন্ন করতে হলে লেসার রশ্মির সাহায্যে সৃষ্ট শক ওয়েভ targetকে সংকুচিত করবে, সেই সঙ্গে প্রায় 108k তাপ উৎপন্ন হবে। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বিকীরণ বিশেষ করে উচ্চ শক্তি সম্পন্ন ইলেকট্রন মূল শকওয়েভ

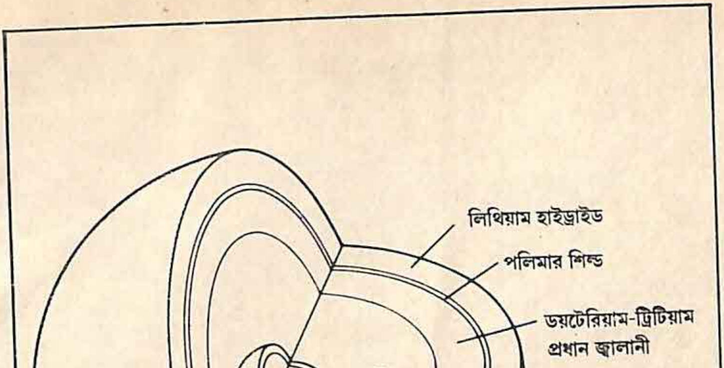


নিউক্লিয়ার ফিউসন-এর রৈখিক চিত্র

ঘটাতে বাধা দেয় এবং সংকোচন দেরী হয়ে যায়। অর্গানোমেটালিক পলিমারের তৈরী বহু আচ্ছাদনযুক্ত টার্গেট নির্মিত হওয়ায় এখন এই অসুবিধা দূর হয়েছে। অতি উচ্চ তাপ শোষক আধার হিসাবে পলিমারের এই অত্যাশ্চর্য ব্যবহার পলিমার বিজ্ঞানকে বহুদূর এগিয়ে নিয়ে এসেছে, সন্দেহ নেই।

পলিমার—আধুনিক জীবনের নিত্যসঙ্গী

বর্তমান সভ্যসমাজে পলিমারের ব্যবহার চলছে জীবন যাত্রার সকল ক্ষেত্রেই। আমাদের পোষাক-আশাক, চিকিৎসাবিজ্ঞান, যানবাহন এমনকি মহাকাশ অভিযান—সব কিছুতেই পলিমার উপকরণ অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। বাস্তবিক পক্ষে পলিমার গবেষণার ব্যাপক উন্নতি লাভ না হলে মহাকাশ



অর্গানো-মেটালিক পলিমারের তৈরী বহু আচ্ছাদন যুক্ত টার্গেট—
এখানে নিউক্লিয়ার ফিউসন প্রক্রিয়া চলে

অভিযানে আজ আমরা এতদূর এগিয়ে আসতে পারতাম কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। মানুষের শিল্প, প্রযুক্তি ও সভ্যতায় পলিমার গবেষণা এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে। ধাতুকে আস্তে আস্তে সরিয়ে দিয়ে তার স্থান আজ দখল করছে নিত্য নতুন আবিষ্কৃত নবীন পলিমার। এই পলিমার industrial hazards-ও যে কমিয়ে আনছে তাতে আর সন্দেহ কি। আজকের যুগ হচ্ছে অতি ক্ষুদ্র এবং অতি বৃহতের যুগ—'অণোরণীয়ান মহতো মহীয়ান', তাই পলিমারের অতিকায় দাপট তো থাকবেই। বিস্মিত পুলকিত, রোমাঞ্চিত হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভুবনমোহন বিশ্বরূপ প্রত্যক্ষ করেছিলেন অর্জুন। এই পলিমার রসায়নও ভবিষ্যতে তেমনি এক অনির্বচনীয় জগতের দুয়ার খুলে দেবে একবিংশ শতাব্দীর মানুষের কাছে যা হয়ত বিশ্বব্যাপী ঐ স্বরূপ দর্শনের সঙ্গেই তুলনীয়।